মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৬, সংখ্যা-১২

জানুয়ারি ২০১৮ ইং, রবিউস সানি ১৪৩৯ হি., পৌষ ১৪২৪ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

ربيع الثانى ١٤٣٩هـ، يناير ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৭... ৬
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৮
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
মন্দের প্রতিরোধ.. ৯
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
নবীজি (সা.) কি আলিমুল গায়েব ছিলেন?........... ১১
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব
আন্তধর্মীয় সংলাপ : উদ্দেশ্য ও করণীয় ১৪
মুফতী শাহেদ রহমানী
বাংলাদেশের সংস্কৃতি কোন পথে?..................... ১৯
মাওলানা শরীফ উসমানি
লা-মাযহাবী মতবাদের স্বরূপ সন্ধানে................. ২৩
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী
শিশুশিক্ষা : অভিভাবকের করণীয়.................... ২৮
মুফতী শরীফুল আজম
ভিন্ন চোখে কওমি মাদ্রাসা-১৫ .... ৩২
মাওলানা কাসেম শরীফ
সততা এবং আমানতদারি.............................. ৩৫
কারী জসীম উদ্দীন কাসেমী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৯
ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-১৬........................... ৪৩
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিন সংকট : উত্তরণ কোন পথে?

আরব ভূখণ্ডের ঐতিহ্যবাহী পবিত্র নগরী জেরুজালেমকে ইসরায়েলের একতরফা রাজধানী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্বীকৃতি দানের ঘোষণায় আবার অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে গাজা উপত্যকা আর পশ্চিম তীরের শহরগুলোতে। বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে মুসলিম বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিপ্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে ফের সংঘাত উসকে দিয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বিতর্কিত সিদ্ধান্তের নিন্দা জানানো হয়েছে। আমরাও এ ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিরুদ্ধে শান্তিকামী বিশ্বনেতাদের ঐক্যবদ্ধ ও আন্তরিক ভূমিকা প্রত্যাশা করছি।

পক্ষান্তরে ফিলিস্তিন সমস্যাটি এখন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বমানবতার জন্য। এত মানবাধিকার সংস্থা, এত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন; কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুরই যেন হাওয়া লাগে না। একজন বোদ্ধা লেখক ফিলিস্তিন সংকট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, গত ২০০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও জঘন্য হলো ইহুদিবাদীদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখলের ঘটনা। এ বিষয়ে ফরাসি গবেষক রুযে গারুদির মন্তব্য বেশ স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যই ইহুদিবাদের উৎপত্তি। ইহুদিবাদীরা তাদের অবৈধ লক্ষ্য হাসিল করতে ইহুদি ধর্মকে অপব্যবহার করছে।' মূলত ইহুদিবাদীরা কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনি জাতির ওপর চরম দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছে। সেখানে চালানো হচ্ছে জাতিগত নিধনযজ্ঞ। ফিলিস্তিন দখল করে সেখানে এমন একটি অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকেই সংকটের গভীরে নিক্ষেপ করেছে। যা থেকে উত্তরণ ঘটানো আজও সম্ভব হয়নি।

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে কয়েক দশকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত পুরো মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকেই অগ্নিগর্ভ ও অস্থিতিশীল করে তুলেছে। ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্মম ও নিষ্ঠুর গণহত্যা চালিয়েছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় বহুপক্ষীয় প্রচেষ্টা চালানো হলেও তা কখনো ফলপ্রসূ হয়নি। সে ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে ফিলিস্তিনি-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি এবং ফলশ্রুতিতে উভয় শীর্ষ নেতা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেও শান্তিটা এখন পর্যন্ত অধরায় রয়ে গেছে। তা অধিকৃত ভূখণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়নি।

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল শান্তি প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসেও অনুষ্ঠিত হয় মধপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন। ৭০টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন এ সম্মেলনে। উদ্দেশ্য, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসান। ওই সম্মেলনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, দুই পক্ষের কারোরই একতরফাভাবে এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়; যাতে ভবিষ্যৎ আলোচনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সম্মেলনকে ফিলিস্তিন স্বাগত জানালেও ইসরায়েল একে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্মেলন বলে উল্লেখ করেছে। দেশটি বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এর ফল মানতে তেল আবিব বাধ্য নয়। ফলে শুরুতেই এই সম্মেলন কার্যকারিতা হারিয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেছিলেন।

ফিলিস্তিনের নেতা মাহমুদ আববাসের সঙ্গে বৈঠকে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের দীর্ঘকালের বিরোধ নিরসনের আশা প্রকাশ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

খবরে প্রকাশ, গত মে ২০১৭ ইং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি উভয় জাতিই একটি শান্তিচুক্তি চায়। এত দিন একে যতটা কঠিন হিসেবে দেখা হয়েছে, ততটা কঠিন হবে বলে তিনি মনে করেন না।

এ সময় হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ও মাহমুদ আব্বাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি এ কথাগুলো বলেন। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর সঙ্গে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের প্রথম সাক্ষাৎ।

বৈঠকের পর দুই নেতার যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তিচুক্তি নিয়ে ট্রাম্প বলেন, "আমরা এটা করবই।"

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বৈঠকে মাহমুদ আব্বাস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে জানান ১৯৬৭ পূর্ব সীমান্তের ভিত্তিতে দুই রাষ্ট্র সমাধানের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী শান্তিচুক্তি চান তাঁরা।'

'ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুই জাতিই সহিংসতায় উসকানি বন্ধের পথ না পেলে সেখানে স্থায়ী শান্তি আসবে না।'

এসব প্রতিশ্রুতি ও বক্তব্যদানের কিছুদিনের মাথায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং জেরুজালেমকে ইসরায়েলের একতরফা রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। যার কারণে মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা দুনিয়ায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ইহুদিরা ইসরায়েলে নিজেদের দখলদারিত্ব মজবুত করার পর থেকে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সর্ব ক্ষেত্রে তাদের এরূপ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনামূলক পদক্ষেপের কোনো ইতি নেই। বড় পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলিম বিশ্বও এসব প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি, শান্তি বৈঠক ইত্যাদি সব কিছুতেই আশাবাদী হয়ে ওঠে।

আবার ইহুদিদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় দেখা যায় এই সম্প্রদায়ের কাজই হলো পুরো দুনিয়াকে অস্থির-অস্থিতিশীল রাখা, প্রতিপক্ষ বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করার নীলনকশা তৈরি ও বাস্তবায়ন। এর জন্য তারা নিজেদের চিরশত্রু ঈসায়ীদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করে। চিরাচরিত কৌশল ও ধূর্ততার মধ্য দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সাথে মিত্রতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। আজ থেকে কয়েক শ বছর পূর্বেও বিশ্বচিত্র ছিল এর বিপরীত। হিটলারের ইহুদি নিধনের ঘটনা তো এত তাড়াতাড়ি বিশ্ব ভুলে যাওয়ার কথ নয়। কিন্তু এখন তাদের আন্তরিক মিত্র তাদের সে শত্রুরাই। সুতরাং এসব বিশ্ব মোড়লদের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি, আবেদন নিবেদনকে চূড়ান্ত পথ মনে না করে মুসলিম বিশ্বগুলো এই দীর্ঘ সমস্যার সমাধানে স্বতন্ত্র পথ খুঁজতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।

মুসলিম বিশ্ব এসব সমাধানে পবিত্র কোরআন-সুন্নাহের দিকে ফিরে যেতে পারে। ইহুদি এবং ঈসায়ী সম্পর্কে পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর বিধান কী, তাদের সাথে বন্ধুত্ব আর মিত্রতার মাপকাঠি কী, পবিত্র কোরআন তাদের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে কী বলেছে–এসব বিবেচনা করলেও এ সমস্যাগুলোর সমাধানে স্বতন্ত্র পথ বের হয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

বাহ্যত মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই একতরফা ঘোষণার পর তাদের বিরোধিতা আসছে সর্বমহল থেকেই। মধপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করার আশঙ্কায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্তের নিন্দা জানানো হয়েছে। সৌদি আরব বলেছে, এই সিদ্ধান্ত পুরো মুসলিম বিশ্বের জন্য চরম এক উসকানি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পের সিদ্ধান্তটি 'অকাজের' হিসেবে অভিহিত করেছেন। রাশিয়া বলেছে, মার্কিন এ স্বীকৃতি এক বিপজ্জনক ঝুঁকি এবং এটি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে বিশ্বে। সম্প্রতি বাংলাদেশে ট্রাম্পের এ ঘোষণাকে 'অগ্রহণযোগ্য' হিসেবে খারিজ করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আমরাও মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রের এ ঘোষণা প্রত্যাহারই এখন শান্তির পথ সুগম করতে পারে। বিশ্বনেতাদের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিরোধিতা করা, সেই সঙ্গে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তিপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হওয়া। এ ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের যে ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে এটিকে স্থায়ী এবং মজবুত ঐক্যে পরিণত করে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাকে স্বতন্ত্রভাবে সমাধানে এগিয়ে আসা। মুসলিম উম্মাহের দায়িত্ব হলো, আল্লাহ তা'আলার মর্জি মতে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সব সময়, বিশেষ করে সব আমলের পর আল্লাহ তা'আলার কাছে আন্তরিক ও কায়মনোবাক্যে দু'আ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলের সহায় হোন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৫/১২/২০১৭ ইং

হযরত মাওলানা আব্দুল বাসিত বরকতপুরী (রহ.)-এর ইন্তেকালে জাতি এক যোগ্য অভিভাবককে হারাল

মুফতী আরশাদ রহমানী

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীমের প্রাক্তন মহাসচিব, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল বাসিত বরকতপুরী (রহ.)-এর ইন্তেকালে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকার মহাপরিচালক, মাসিক আল-আবরারের প্রধান সম্পাদক হযরত মাওলানা মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর ইন্তেকালে জাতি এক যোগ্য অভিভাবককে হারাল। তাঁর বিশাল দ্বীনি খিদমাত এবং কর্মযজ্ঞ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর জীবন নিবেদিত দ্বীনি খিদমাতগুলো কবুল করেন এবং তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ মকাম দান করেন। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত-অনুরক্ত এবং ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সকলকে সবরে জামীলের তাওফীক দানের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন।

মুফতী আরশাদ রহমানী তাঁর শোক বার্তায় বলেন, এ ধরনের মনীষীদের ক্রম বিদায়ে দ্বীনি হলকায় বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। রিজালুল্লাহর ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, যা অপূরণীয়। তিনি নতুন প্রজন্ম তালিবে ইলমদের আকাবির-আসলাফের নমুনা ও আদর্শ ধারণ করে যোগ্য স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ـ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ـ

"আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে কখনো ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তু সামগ্রী দান দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারি, কাকড়ি, গম, মসুর, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মুসা (আ.) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও, যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে, যা উত্তম? তোমরা কোনো নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে, যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের ওপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে তারা আল্লাহর বিধি-বিধান মানত না এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান, সীমা লঙ্ঘনকারী।

নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদি, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সাওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনোই ভয়ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাকারা ৬১-৬২)

জ্ঞাতব্য : মূলত ইহুদিরা মান্না ও সালওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই ওসব সবজি ও শস্যের জন্য আবেদন করল। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। তাদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ইহুদিদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হলো। অবশ্য কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে সর্বমোট চল্লিশ দিনের জন্য নিছক লুটেরা দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন-শৃঙ্খলা বিবর্জিত ইহুদি-দাজ্জালের কিঞ্চিত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোনো বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলতে পারবে না। আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আ.)-এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে যদি নির্দেশ অমান্য করো, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন সূরা আরাফে বলা হয়েছে,

واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيٰمة من يسومهم سوء العذاب۔

এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে নিশ্চয়ই তিনি ইহুদিদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ (নিয়োগ) করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌঁছাতে থাকবে।

বস্তুত বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও ব্রিটেনের গোলাম বৈ আর কিছু নয়।

এ ছাড়া বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদিদের হাতে নিহত হয়েছেন, যা নিতান্ত অন্যায় বলে তারা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করত; কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল।

ইহুদিদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের ফলে উদ্ভূত সন্দেহ ও তার উত্তর :

উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহুদিদের শাস্তি ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ উল্লেখ করেছেন। কোরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাছীরের ভাষায় :

لايزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وضرب عليهم الصغار

অর্থাৎ তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।

বিশিষ্ট তাফসীরকার ইমাম যাহহাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা অবমাননার অর্থ :

هم اهل القبالات يعنى الجزية

অর্থাৎ ইহুদিগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা আলে ইমরানের এক আয়াতে আছে :

ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس

অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত তারা যেখানে যাবে, সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন–অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক, যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে। আর

মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি, যার একটি রূপ এও হতে পারে যে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কোরআনের আয়াতে من الناس বলা হয়েছে من المسلمين বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

সারকথা, ইহুদিগণ উপরিউক্ত দুই অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে। ১. আল্লাহপ্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। ২. কিংবা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদের এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে তাদের সাহায্যে এ গঞ্জনা ও অবমাননা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এমনিভাবে সূরা আলে ইমরানের আয়াত দ্বারা বাকারার আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে গেল। অধুনা ফিলিস্তিনে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা যায় যে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায় ফিলিস্তিনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। উত্তর সুস্পষ্ট কেননা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বর্তমান রাষ্ট্রের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা সম্যক অবগত তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরায়েলের নয়, বরং আমেরিকা ও ব্রিটেনের একটি ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির ওপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কি না, সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরায়েল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীদের দৃষ্টিতে একটা অনুগত ও আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কোরআনের বাণী بحبل من الناس এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নকরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভেতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইহুদিরাই সর্বপ্রাচীন জাতি। তাদের ধর্ম, তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি সর্বাপেক্ষা পুরনো। সারা বিশ্বে ফিলিস্তিনের এক ক্ষুদ্র ভূভাগ কোনো প্রকারে তাদের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে, তবু এটা বিশাল বিশ্ব মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর চেয়ে অধিক মর্যাদার দাবি রাখে না। অপরপক্ষে খ্রিস্ট রাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের পতন যুগ সত্ত্বেও তাদের রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের রাষ্ট্রসমূহ, যা বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত সে তুলনায় ফিলিস্তিন এবং তাও আবার অর্ধাংশ– তদুপরি আমেরিকা ও ব্রিটেনের পক্ষপুষ্ট এবং আশ্রয়াধীন, এরূপভাবে যদি সেখানে ইসরায়েলদের কোনো অধিকার ও শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়েও যায়, তবে এর দ্বারা গোটা ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর তা'আলার পক্ষ হতে আরোপিত চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অবসান হয়েছে, এরূপ ভাবতে পারা যায় কি? এরূপ ভাবার কোনোই অবকাশ নেই।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى

নীতি ও আইনের মর্ম সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে আমার দরবারে কোনো ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, সে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটা সুস্পষ্ট যে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ণ আনুগত্য মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতে সীমাবদ্ধ। যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে, সেই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ এত সব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরেও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

বস্তুত আলোচ্য এ আইনে বাহ্যত মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা তারা তো মুসলমান আছেই। কিন্তু এতে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর উদাহরণ এই যে, কোনো শাসক বা সম্রাট কোনো বিধান প্রয়োগকালে যদি এরূপ ঘোষণা করেন যে আমার বিধান সাধারণ ও ব্যাপক সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, সপক্ষীয়-বিপক্ষীয় শত্রু-মিত্র যে-ই এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, সে-ই অনুকম্পা পাত্র হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে যারা সপক্ষীয় মিত্র তারা তো আনুগত্য প্রদর্শন করেই চলেছে, আসলে যারা বিরোধী ও শত্রু তাদেরকেই ঘোষণাটি শোনানোর উদ্দেশ্য। কিন্তু এর নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে অনুগত ও মিত্রদের প্রতি আমার যে অনুকম্পা, তার কারণ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয় বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও নয়, বরং তার মিত্রতা ও বশ্যতাগুণের ওপরই আমার অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নির্ভরশীল। সুতরাং বিরোধী শত্রুও যদি এ বশ্যতা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেও সপক্ষীয় মিত্রের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সমপরিমাণ অনুকম্পা ও অনুগ্রহ লাভ করবে। সে জন্যই পূর্বোক্ত আইনে বিরোধী শত্রুর সাথে সপক্ষীয় মিত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন অবলম্বনে)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৭

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–প্রথম অধ্যায় :

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

হাদীস নং-৮ :

قال النبى صلى الله عليه وسلم (من ترك صلاة حتى مضى وقتها عذب فى النار حقبا) والحقب ثمانون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم الف سنة

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি নামায কাজা করে সে এক হোকবা পরিমাণ জাহান্নামে জ্বলবে। ৮০ বছরে এক হোকবা হয়। আর এক বছর ৩৬০ দিনে আর কিয়ামতের এক দিন এক হাজার বছরের সমান হবে। এ হিসানে এক হোকবার পরিমাণ হলো দুই কোটি ৮৮ লক্ষ বছর।

(তাফসীরে রূহুল বায়ান ১/৩৪, ২৭৬, মাজালেসে আবরার)

(أ)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَوَيْهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :إِنَّ فِى جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يَسْتَعِيذُ جَهَنَّمُ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِى فِى كُلِّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ أُعِدَّ ذَلِكَ الْوَادِى لِلْمُرَائِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِحَامِلِ كِتَابِ اللهِ، وَلِلْمُصَدِّقِ فِى غَيْرِ ذَاتِ اللهِ، وَلِلْحُجَّاجِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلِلْخَارِجِ فِى سَبِيلِ اللهِ

"জাহান্নামে একটি উপাত্যকা আছে, স্বয়ং জাহান্নাম যার থেকে প্রতিদিন চারশতবার আশ্রয় চায়। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে মূলত উম্মতের রিয়াকারদের জন্য। সে হাফেজ হোক, দান সদকাকারী হোক, হাজী হোক এবং আল্লাহর পথে বের হয়েছে এমন হোক।

(আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ১২/১৭৫ হা. ১২৮০৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/২২২, ইতহাফ ১০/৫১১ হা. ৫১২, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৮/৪৬৪)

হাদীসটির মান : হাসান

(ب) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (الماعون :٥) قَالَ :هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

"রাসূল (সা.) কে الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ অর্থাৎ যারা তাদের নামাযে গাফলতী করে' (এর ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, এরা ওই সব ব্যক্তি যারা সময়মত নামায আদায় করে না।

(মুসনাদে আবু ইয়ালা ১/৩৭৮ হা. ৮১৮,৭০০, আস সুনানুল কুবরা [বায়হাকী] ২/২১৪ হা. ৩১৬৩, আল মুজামুল আওসাত [তাবারানী] ৩/৪৭ হা. ২২৯৭,)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(ج)

أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمْدَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم٥٩) قَالَ :نَهَرٌ فِى جَهَنَّمَ بَعِيدُ الْقَعْرِ خَبِيثُ الطَّعْمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

"পবিত্র কোরআনের আয়াত فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا এর ব্যাখ্যায় বলেন, غـى হলো জাহান্নামের অতল গভীর একটি নদী। যার খাদ্য হবে কল্পনাতীত নিকৃষ্ট।

(মুসতাদরাকে হাকেম ২/৩৭৫ হা. ৩৪১৮)

ক.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْفِرْيَابِيُّ وَهَنَّادٌ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ :سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هِلَالَ الْهِجْرِيَّ :مَا تَجِدُونَ الْحُقُبَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ :نَجِدُهُ ثَمَانِينَ سَنَةً، كُلُّ سَنَةٍ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ أَلْفُ سَنَةٍ

হযরত আলী (রা.) হেলাল হাজরী (রহ.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ৮০ বছরে এক হোকবা। প্রতিবছর ১২ মাস। প্রতি মাসে ৩০ দিন। আর প্রতিদিনে এক হাজার বছরের সমান।

(তাবারী ১২/৪০৪ হা. ৩৬০৫১)

খ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :(لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا) (النبأ٢٣) قَالَ :الْحُقُبُ ثَمَانُونَ سَنَةً هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে সহীহ রেওয়ায়াত মোতাবেক ৮০ বছর বর্ণিত হয়েছে।

(মুসতাদরাকে হাকেম ২/৫২১ হা. ৩৮৯০)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) খোদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন যে ৮০ বছরে এক হোকবা, ৩৬০ দিনে এক বছর এবং এক দিন তোমাদের এই জগতের হিসাবে এক হাজার দিনের সমান হয়।

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ قَالَ :الْحُقُبُ :ثَمَانُونَ سَنَةً وَالسَّنَةُ :سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ يَوْمٍ، وَالْيَوْمُ :أَلْفُ سَنَةٍ

أخرجه الطبرى فى تفسيره، ج ٣٠، ص ١٦ .قال الهيثمى فى مجمع الزوائد " :رواه البزار وفيه حجاج بن نصير وثقه ابن حبان ,وقال يخطئ ويهم ,وضعفه جماعة ,وبقية رجاله ثقات .(مجمع الزوائد / الهيثمى، ج ٧، ص ١٣٣).

(তাফসীরে তাবারী ১২/৪০৪ হা. ৩৬০৫২, আসসাহীহুল মাসবূর মিন তাফসীরিল মাসূর ৪/৫৮৩)

হাদীসটির মান : হাসান

ঘ. রাসূল (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জেনেবুঝে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয় তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেওয়া হয় এবং তাকে তাতে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে।

أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا أبى، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، نا صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا كُتِبَ اسْمُهُ عَلَى بَابِ النَّارِ فِيمَنْ يَدْخُلُهَا

(হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২৫৪, কানযুল উম্মাল হা. ১৯০৯০)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঙ. আরো বর্ণিত আছে, জাহান্নামে একটি ময়দান আছে, যার নাম লমলম। তাতে উটের ঘাড়ের মতো মোটা মোটা সাপ রয়েছে, তাদের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথের সমান। তাতে নামায ত্যাগকারীদের শাস্তি দেওয়া হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ,ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ,ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ,ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ,ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ,قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ,يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ,يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ لَمْلَمُ وَإِنَّ أَوْدِيَةَ جَهَنَّمَ لَتَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ حَرِّهِ

(হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/১৭৮)

হাদীসটির মান : হাসান

চ. অন্য এক হাদীসে আছে, জাহান্নামে জুববুল হাযান নামক একটি ময়দান রয়েছে, তা বিচ্ছুদের আবাসস্থল। একেকটি বিচ্ছু খচ্চরের মতো বড় হবে। সেগুলো নামায ত্যাগকারীদের দংশন করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ :حَدَّثَنِي الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ :وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ : وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

(সুনানে তিরিমিযী ৪/৫১২ হা. ২৩৮৩, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১৬৮, আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ৩/২৬১ হা. ৩০৯০)

হাদীসটির মান : হাসান লিগাইরিহী

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

ছাত্রদের প্রতি মূল্যবান নসীহত :

যথাসম্ভব ঋণ নেবে না। অতি বাধ্যতা ভিন্ন কথা। তবে ছাত্রদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। তারা নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে যে কাজে এসেছে, সেই কাজেই তাদের মনোনিবেশ করা আবশ্যক। অনেকে বন্ধুত্ব আর বিভিন্ন অহেতুক কাজে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় বন্ধুদের চক্রে পড়ে টাকা খরচ হয়। একপর্যায়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের মাদরাসায়ে আশরাফিয়ায় এমন কঠোর নিয়ম আছে যে হাদিয়া নেওয়াও যাবে না, দেওয়া যাবে না। কারো দাওয়াত খাওয়াও যাবে না, দাওয়াত দেওয়াও যাবে না। এসব বিষয় ছাত্রদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অহেতুক কাজের জন্য ঋণ নিও না। খাওয়ার মধ্যে অতিমাত্রায় আড়ম্বরতার ফিকির করো না। সামান্য বিষয়েও অনেক সময় মানুষকে পেরেশানিতে নিপতিত হতে হয়।

সম্পদও নিয়ামত, তা নষ্ট করো না :

আল্লাহ তা'আলা অনেককে অঢেল সম্পদ দিয়েছেন, টাকা-পয়সা দান করেছেন। তাদের খরচের ব্যাপারে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। এসবও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। তা নষ্ট করা যাবে না। অপচয় করো না। তা ভালো নয়। তার উপমা সাধারণত এই, এক লোক বদনা নিয়ে দিনে এক দুইবার বাথরুমে যায়। আরেকজন আছে সারা দিন কয়বার যে বাথরুমে যায়, তার কোনো হিসাব নেই। অতিমাত্রায় বাথরুমে যাওয়া ভালো খবর নাকি? বারবার যাওয়া কল্যাণের বিষয় নয়। বরং তা রোগ হওয়ার আলামত। বারবার খরচ করাও সেরূপ। খারাবির মূল হলো প্রয়োজন ছাড়া মার্কেটে যাওয়া। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস দেখে, আর বাছবিচার ছাড়া তা ক্রয় করতে থাকে। অনেক সময় কোনো উপকারে আসবে না, এমন বস্তুও ক্রয় করা হয়। এমনিভাবে অহেতুক জিনিসপত্রেরও স্তূপ হয়ে যায়। এমনিভাবে অপচয় ও অহেতুক খরচে জড়িয়ে পড়ে। তাই যখন দরকার হবে, তখনই বাজারে যাওয়া। প্রয়োজনবিহীন বাজারে ঘোরাফেরা ঠিক নয়। তাতে ইনশাআল্লাহ অপচয় রোধ হবে। তা ছাড়া অনেক উপকারও রয়েছে।

অতিরিক্ত আয়োজনের ক্ষতি :

হযরত গঙ্গুহী (রহ.) একদা হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহ.)-এর সাহেবজাদার মেহমান হলেন। তিনি নিজ ঘরের অবস্থা সম্পর্কে বললেন, যখন আয় হয় তখন খাওয়ার থাকে, আয়-উপার্জন না হলে তা বন্ধ থাকে। আজ তেমনি হয়েছে। অর্থাৎ আজ কোনো আয়-উপার্জন হয়নি। হযরত গঙ্গুহী (রহ.) বলেন, তোমার যে অবস্থা, আমারও তা হবে। সুতরাং দুপুরের খানাপিনা হয়নি। সন্ধ্যায় এক রোগী এল। কিছু ওষুধ বিক্রি হলো। তাতে কিছু কামাই হয়েছে। সন্ধ্যায় মুরগির গোশত পাক হলো। মূল কথা হলো, অতিরিক্ত আয়োজন থেকে বেঁচে থাকা। পাছে লোকে কী বলবে সেদিকে না তাকানো। বরং নিজের অবস্থা অনুযায়ী খরচ করা। ইনশাআল্লাহ পেরেশানি থাকবে না। শান্তি ও স্বস্তিতে থাকা যাবে। যখনই মনে আসবে যে লোকে কী বলবে, তখন থেকে পেরেশানি আরম্ভ। আড়ম্বরতা তখন থেকেই চেপে বসে। এটি কিন্তু ভয়ানক বিষয়। তা মানুষকে ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দেয়।

প্রত্যেকের অসিয়তনামা তৈরি হওয়া প্রয়োজন :

প্রত্যেক মানুষের সময় নির্ধারিত। নির্ধারিত সময়ে সকলকে চলে যেতে হবে। কারো সফর অসুস্থতার মধ্যে হয়ে থাকে। কারো আবার অন্যভাবে। ২২ মহররম ১৪১৩ রবিবার মাওলানা নাসিরুদ্দীন বলে ছিলেন এখানে আসার জন্য। তিনি মুম্বাইয়ের মেহমান ছিলেন, তাঁকে পৌঁছে দিয়ে লৌক্ষ থেকে আসার পথে সধুলির কাছাকাছি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেলেন। এই কারণেই পরামর্শ হলো, প্রত্যেকের অসিয়তনামা থাকা চাই। তাতে লেনদেন ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে লিখিত থাকা আবশ্যক।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) সেরূপই করতেন।

যথাসম্ভব বন্ধু, সহকর্মী এবং প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ভালো রাখা প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা অহরহই ঘটছে।

সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকা। কোনো প্রকার গোনাহের অভ্যাস যেন না হয়। হঠাৎ গোনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করা জরুরি।

লেনদেন খুব পরিষ্কার রাখা। হঠাৎ যদি মৃত্যু এসে যায় তাতে যেন অন্যের কষ্ট না হয়।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলতেন, আমার কাছে প্রত্যেকের জিনিস আলাদা আলাদা থাকে। যাতে তরকা ভাগ করতে কষ্ট না হয় এবং কারো হক যেন থেকে না যায়।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

মন্দের প্রতিরোধ

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তিকে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়, একজন সফল ব্যক্তিত্ব হতে চাইলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকল্প নেই। মন্দের প্রতিদান উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেওয়া উৎকৃষ্ট মানের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাই তো পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে মন্দের প্রতিদান উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেওয়ার নির্দেশ ও তা'লীম দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে যে ভালো ও মন্দ সমমানের নয়। ইরশাদ হচ্ছে :

ولاتستوى الحسنة ولا السيئه ادفع بالتى هى احسن۔

ভালো ও মন্দ সমান হয় না, তুমি মন্দকে প্রতিহত করো এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। চারিত্রিক এই গুণের অধিকারী হতে পারলে এর সুফল হাতে নাতে নগদ পেয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে চরম শত্রুও পরম বন্ধু হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে :

فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم۔

'তার ফল হবে এই যে, যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (সূরা হামীম সাজদা-৩৪)

এই গুণের অধিকারী দুই শ্রেণীর লোকই হতে পারে। (ক) ধৈর্যশীল ও (খ) মহাভাগ্যবান। কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وما يلقها الا الذين صبروا۔ وما يلقها الا ذو حظ عظيم۔

'আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবরের পরিচয় দেয়, এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা মহাভাগ্যবান।' (সূরা হামীম সিজদা-৩৫)

বর্ণিত আছে, এক লোক হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত, গালি দিত, মন্দ ও কটু কথা বলত। ঈসা (আ.)-এর অনুসারীগণ এতে বিচলিত হতো। একবার তারা আরজ করল–হযরত! এই লোক আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, আর আপনি কিনা তার জন্য দু'আ করছেন। উত্তরে হযরত ঈসা (আ.) বলেন, كل إناء يترشح بما فيه۔ 'পাত্রে যা থাকে, তা-ই পড়ে।' সে খারাপ-মন্দ, তাই সে আমার সঙ্গে খারাপ ও মন্দ আচরণ করেছে, আর আমার মধ্যে ভালো গুণ রয়েছে, তাই আমি তার সঙ্গে সদাচরণ করছি তার জন্য দু'আ করছি।

ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে, কেউ যদি তোমার সঙ্গে মন্দব্যবহার ও মূর্খতাসুলভ আচরণ করে তাহলে তুমি তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং মূর্খতাসুলভ আচরণ পরিহার করবে। কেননা নাপাক কাপড় কখনো প্রস্রাব দ্বারা পাক হয় না। নাপাক কাপড় পাক করার জন্য পবিত্র পানির বিকল্প নেই। তদ্রূপ মন্দ দ্বারা মন্দ সংশোধন করা যাবে না। বরং মন্দ স্বভাব দূর করতে হলে সদাচরণের আশ্রয় নিতে হবে। তাহলে এর সুফল দুনিয়াতে পাওয়া যাবে, আর আখিরাতের পুরস্কার তো রয়েছেই। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

ويدرئون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار۔

'আর যারা মন্দের প্রতিরোধ ভালো দ্বারা করে প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য।' (সূরা রা'দ-২২)

পবিত্র কোরআনে 'প্রতিরোধ' শব্দ ব্যবহার করে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ভালো ব্যবহারের পরিণামও ভালো হয়। এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত অন্যের দুর্ব্যবহারের কুফল খতম হয়ে যায়।

রাসূল (সা.)-এর ধৈর্য ও সহনশীলতা :

রাসূল (সা.)-এর ৬৩ বছরের জীবনে ক্ষমা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং অন্যের প্রতি সহানুবর্তিতার এমন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যা পর্যালোচনা করলে যে কেউ অবাক হয়ে যায়। মানব ইতিহাসে অন্য কেউ এ পরিমাণ ক্ষমা করেনি, যে পরিমাণ ক্ষমা রাসূল (সা.) নিজ শত্রুদেরকে করেছেন। রাসূল (সা.)-এর আখলাক-আদর্শ সকলের জন্য অনুসরণীয় ও পালনীয়।

কাযী আয়ায (রহ.) লেখেন :

وهو صلى الله عليه وسلم لايزيد من كثرة الأذى إلا صبرا۔

'শত্রুপক্ষ যতই কষ্টের পরিমাণ বাড়াত, রাসূল (সা.)-এর ধৈর্যের

সীমা তত বৃদ্ধি পেত।'

وعلى اسراف الجاهل إلا حلماـ

'মূর্খ লোকের আচরণে তাঁর সহনশীলতার মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেত।' অধীনস্তদের সঙ্গে তাঁর সহনশীলতা, পরিবারের লোকদের সঙ্গে সহনশীলতা, তায়েফবাসীর জন্য বদ দু'আ করতে অস্বীকৃতি, উহুদ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পরও শত্রুপক্ষের জন্য হেদায়েতের দু'আ, শত্রু দেশে খাদ্য রপ্তানি করার আদেশ প্রদান, মেয়ের হত্যাকারীকেও সাধারণ ক্ষমা, বিষ পরিবেশনকারী ইহুদি নারীকে ক্ষমা করা। আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দা এবং ওয়াহশীর মতো অপরাধীকে ক্ষমা করা আর মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা–এ সবই ছিল মহানবী (সা.)-এর ক্ষমা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার উদাহরণ মাত্র।

মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তুলুন :

আজ আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। সামান্য কারণে ছোটখাটো বিষয়ে আমরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাই, বন্ধুত্বের ইতি টানি। সালাম-কালাম, কথা-বার্তা বন্ধ করে দিই, এমনকি কেউ কারো ছায়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারি না। পরশ্রীকাতর আর অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হওয়ার বিষয়টি তো একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। অতি সাধারণ কারণেও শত্রু হয়ে যাওয়া সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। এত কিছুর পরও আমরা মনে করি, আমাদের থেকে বড় মুত্তাকী, পরহেযগার, দ্বীনদার এই ভূপৃষ্ঠে দ্বিতীয়জন নেই। আচ্ছা বলুন তো, এটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? আ রে ভাই! আপনি মানুষ হয়ে ফেরেশতা কোথায় পাবেন। আপনাকে মানুষের সঙ্গেই মিলে ঝুলে চলতে হবে, থাকতে হবে। একটি ভুলের কারণে অন্যের ভালো দিকগুলোকে স্বীকার না করা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে না দেখা নববী আদর্শের ধারক-বাহকের পরিচায়ক হতে পারে না।এটাকে দীক্ষা বা সদাচরণ–কোনোটাই বলা যাবে না।

আমাদের এই দুরবস্থার কারণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও নববী আদর্শ থেকে আমাদের বিচ্যুতি। অহংবোধ আমিত্ব ও কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার অদম্য নেশা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নববী আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গ্রন্থনা : মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আলিমুল গায়েব ছিলেন?

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আলিমুল গায়েব তথা পূর্বাপর এবং বর্তমানের সকল বিষয়ে অবগত ছিলেন?

আলিমুল গায়েব বলা হয়, যিনি অদৃশ্যের সকল খবর এবং অদৃশ্যের সকল বিষয় কেউ জানানো ব্যতীত নিজস্বভাবে জানেন। আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। কোনো নবী-রাসূল আলিমুল গায়েব ছিলেন না।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর গায়েব জানা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে ইহকালীন ও পরকালীন দৃশ্য-অদৃশ্যের সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করেছেন। বিশেষ করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর শান অনুযায়ী অতীত ও ভবিষ্যতের অসংখ্য ঘটনা, আলমে বরযখ, কবরের অবস্থা, ময়দানে মাহশারের চিত্র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়েছেন, যা অন্য কোনো নবী এবং নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাকেও জানানো হয়নি। এগুলো থেকে অনেক বিষয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকেও জানিয়েছিলেন। এটাকে গায়েব জানা বলা হয় না। কারণ এগুলো ছাড়াও অদৃশ্যের অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো তিনি জানতেন না।

সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃশ্য-অদৃশ্যের সকল বিষয় জানতেন এবং পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকে যা কিছু ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে–সব কিছুই তিনি জানেন, অথবা তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে কখন, কোথায় কী হচ্ছে, সব কিছুই তিনি জানেন বা দেখছেন, এমন আকীদা পোষণ করা স্পষ্ট কুফরী ও শিরকী কাজ।

মনে রাখতে হবে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাধারণ থেকে সাধারণ বেয়াদবি যেমন কুফরীর কারণ, ঠিক তেমনি তাঁকে খোদায়ী গুণে, (তথা আলিমুল গায়েবের গুণে) গুণান্বিত করে খোদার আসনে বসানোও সুস্পষ্ট শিরক এবং আল্লাহ তা'আলার শানে চরম বেয়াদবি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক আকীদা পোষণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

কোরআনের অসংখ্য আয়াত এবং নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর অগণিত হাদীস দ্বারা উল্লিখিত আকীদা প্রমাণিত। সেগুলো থেকে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস এখানে পেশ করা হলো।

প্রথম আয়াত :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থ : (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আসমান-জমিনে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। তারা জানে না কখন তারা উত্থিত হবে। (সূরা নামল; আয়াত ৬৫)

দ্বিতীয় আয়াত :

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

অর্থ : (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে। আমি গায়েব জানি না এবং আমি তোমাদের এটাও বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা। আমার নিকট যা প্রত্যাদেশ হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। (সূরা আন'আম; আয়াত ৫০)

তৃতীয় আয়াত :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ : কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। তিনি ভারি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কী রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে

অবগত। (সূরা আন'আম; আয়াত ৩৪)

চতুর্থ আয়াত :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

অর্থ : অদৃশ্যের চাবিকাঠি কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে, তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। (সূরা আন'আম; আয়াত ৫৯)

পঞ্চম আয়াত :

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অর্থ : (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত নিজের ভালো-মন্দের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই। যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না। (সূরা আ'রাফ; আয়াত ১৮৮)

উল্লিখিত সব আয়াতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ (তিনি নবী হোন কিংবা ফেরেশতা) অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না।

প্রথম হাদীস :

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ :وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ :لَا يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন, সে মিথ্যাবাদী। কারণ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন না। (বোখারী; হাদীস ৭৩৮০)

দ্বিতীয় হাদীস :

عن ایاس بن سلمة عن ابیه قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ عَقُوقٍ يَتَبَعُهَا مُهْرُهُ، فَقَالَ :مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ :أَنَا رَسُولُ اللهِ قَالَ :مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ :غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ قَالَ: فَمَتَى نُمْطَرُ؟ قَالَ :غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ قَالَ :فَمَا فِي بَطْنِ فَرَسِي؟ قَالَ :غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ

উপরোক্ত হাদীসের সারাংশ হলো, এক অশ্বারোহী নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গায়েবের বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করল,

১. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

২. আমাদের ওপর বৃষ্টি কখন বর্ষণ হবে?

৩. আমার ঘোড়ার পেটের বাচ্চাটি কী (নর না মাদী)?

নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবগুলোর উত্তরেই বলেছেন, এটা গায়েবের বিষয় আর গায়েব আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। (আল মু'জামুল কাবীর; হাদীস ৬৬৪৫)

এখন প্রশ্ন হলো, যদি নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানতেনই তাহলে তিনি উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে এ কথা কেন বললেন যে এটা গায়েবের বিষয়, আর গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না?

তৃতীয় হাদীস :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهُمْ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالُوا :أَبْدَلْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ

নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার তাঁর কয়েকজন বিবির নিকট গেলেন, তখন তাঁদের ঘরে যে খেজুর ছিল তার চেয়ে উত্তম খেজুর দেখে বললেন, তোমরা এ খেজুর কোত্থেকে পেলে? তাঁরা বললেন, আমরা আমাদের দুই সা' (নিম্নমানের খেজুর)-এর বিনিময়ে এক সা' (উত্তম খেজুর) গ্রহণ করেছি। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হদীস : ১৬১৯১)

এবার বলুন, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি গায়েব জানতেনই তাহলে বিবিদেরকে কেন প্রশ্ন করলেন যে তোমরা এ খেজুর কোত্থেকে পেলে?

চতুর্থ হাদীস :

অর্থ : আমের ইবনে মালেক নামের এক ব্যক্তি নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি নজদবাসীর নিকট কিছু সাহাবী প্রেরণ করা হয় আর তারা নজদবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাহলে আমি আশা করি তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়। তখন তিনি বললেন, আমি তাদের দায়িত্ব নেব। সুতরাং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের শর্তে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৭০ জন সাহাবীর এক জামা'আত, যাঁরা ক্বারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁদেরকে নজদে প্রেরণ করলেন। যখন তাঁরা বীরে মা'উনা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন নজদবাসী এই ৭০ জন সাহাবীকে শহীদ করে ফেলল। (সহীহ বোখারী; হাদীস ৩০৬৪)

সম্মানিত পাঠক! নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি গায়েব জানতেন যে তাঁর ৭০ জন বড় বড় সাহাবীকে শহীদ করে ফেলা হবে,

তাহলে কি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে প্রেরণ করতেন?

পঞ্চম হাদীস :

খাইবার যুদ্ধের পর যাইনাব বিনতে হারিস নামক এক ইয়াহুদী মহিলা কৌশলে নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিষমিশ্রিত বকরির গোশত হাদিয়া পেশ করল। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোশত মুখে দেওয়া মাত্রই 'গোশতের টুকরাটিই' বিষমিশ্রিত হওয়ার বিষয়টি নবীজিকে জানিয়ে দিল। সাথে সাথে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোশত রেখে দিলেন। ইতিমধ্যে নবীজির সঙ্গী সাহাবী হযরত বিশর ইবনে বারা (রা.) তা গলধঃকরণ করে ফেলেন। এর বিষক্রিয়ায় তিনি ইন্তেকাল করেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও এর বিষক্রিয়ায় কিছুটা আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসাস্বরূপ তিনি শিঙ্গা লাগান। ফলে পরবর্তীতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের সময়ও সে বিষক্রিয়া অনুভব করেছিলেন। (সহীহ বোখারী; হাদীস ৪২৪৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহয়া : ৪/১২৭-১২৮)

এখন পাঠকের কাছে প্রশ্ন হলো, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি গায়েব জানতেন তাহলে কি তিনি বিষমিশ্রিত গোশত নিজে মুখে দিতেন এবং নিজ সাহাবীকে খেতে দিতেন?

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলিমুল গায়েব ছিলেন না।

নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গায়েব জানা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদা

বিদ'আতীদের আকীদা হলো, পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সব কিছুই নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানেন। তাঁর মৃত্যুপূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে যখন-যেখানে যা কিছু ঘটছে, সব কিছুই তিনি জানেন। তারা এর সপক্ষে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস পেশ করে। নিম্নে সেগুলো জবাবসহ উল্লেখ করা হলো।

প্রথম আয়াত :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার শান এটা নয় যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েবের বিষয়ে অবগত করবেন, তবে তিনি স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৭৯)

তাদের বক্তব্য হলো, এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে গায়েবের বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াত :

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত গায়েবের বিষয়ে কাউকে অবহিত করেন না। (সূরা জিন্ন; আয়াত ২৬-২৭)

তারা বলে, এই আয়াত স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা নবীজিকে অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।

খণ্ডন : এ কথা সর্বস্বীকৃত যে আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু বিষয়ে গায়েবের জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অদৃশ্যের সকল জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতের পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

এ আয়াতে مَا تُوعَدُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আযাব অথবা কিয়ামত। তাহলে আয়াতের অর্থ হয়, হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি জানি না তোমাদেরকে যে (আযাব বা কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সন্নিকটেই নাকি আমার প্রভু তার জন্য (ভিন্ন) কোনো সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরা জিন্ন; আয়াত ২৫)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হলো যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযাব অথবা কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জানেন না। তাহলে এ কথা বলা কিভাবে সহীহ হয় যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্যের সকল বিষয়ে অবগত?

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলিমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের সর্ববিষয়ে অবগত ছিলেন না। সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলিমুল গায়েব না হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন তাতে সামান্যতম ঘাটতি আসবে না, বরং যথার্থই বাকি থাকবে। কারণ নবী বা রাসূল হওয়ার জন্য গায়েবের ইলম থাকা শর্ত নয়, তাঁর নিকট ওহী আসা শর্ত। যতটুকু অদৃশ্য বিষয় তাঁদের জানানোর প্রয়োজন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহীর মাধ্যমে তাই জানাতেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক আকীদা পোষণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

আন্তধর্মীয় সংলাপ : উদ্দেশ্য ও করণীয়

মুফতী শাহেদ রহমানী

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা আর অতীতের যুগগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জাতি, বিপরীত চিন্তা-চেতনা ও মনমানসিকতার ধারক-বাহক, বিপরীতমুখী জীবনযাপনে অভ্যস্ত জাতি-গোষ্ঠী, ভিন্ন ভিন্ন আমলকারী কওমের সহাবস্থান। শঙ্কামুক্ত ও নিরাপদে বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন মতাদর্শে মিশ্রিত জীবনযাপনকারী মানুষের জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতিগুলো দৃঢ় ও শক্তিশালী রাখা খুবই প্রয়োজন হয়। কেননা অনেক সময় বিমুখিতা বা ঘৃণা, কঠোরতা শুধু পার্থিব জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, তা নয় বরং সেটি দ্বীনি চেতনা ও ধর্মীয় মনস্তাত্ত্বিকতার ওপরও প্রভাব ফেলে। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তার এই সুন্দর বাগান চেতনা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে একেবারেই বিরান হয়ে যায়।

এটা কোনো নতুন দ্বন্দ্ব নয় বরং এটা অতীতেও ছিল। কিন্তু তখন ছিল সীমিত পরিসরে। যখন থেকে যান্ত্রিক যুগের সূচনা হলো, বিশ্বময় বিস্তৃত ভূমণ্ডল সঙ্কুচিত হয়ে একটি আয়নায় দেখা দিতে লাগল, তখন থেকে প্রতিটি সুখ-দুঃখই হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক। এখন এক স্থানের সুখ বা খুশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুখকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু দুঃখ-বেদনার কাহিনীর তুলনায় সুখ ও খুশির সংবাদ খুব কমই আসে। তাই পুরো পৃথিবী একই দুঃখ-বেদনার শিকার বলেই মনে হয়। যার কারণে অস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতাই ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। এই পরিবেশ থেকে উত্তরণের জন্য বিশেষভাবে পরস্পর আলোচনা ও সংলাপকেই একমাত্র চাবিকাঠি ও মৌলিক উপাদান মনে করা হয়ে থাকে। সংলাপ, মতবিনিময়, আলোচনার পরিধি এতই বিস্তৃত হয়েছে যে, পৃথিবী জুড়ে এমন কোনো সমস্যা নেই যার সমাধানে সংলাপ হচ্ছে না। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণ, দলীয় বিরোধ মিটানোর পাশাপাশি ধর্মীয় ও আন্তধর্মীয় ঐক্য গঠনেও হয় সংলাপ। আচমকা ধর্মীয় ও বহুধর্মীয় সংলাপে রহস্যজনকভাবে গতিশীলতা এসেছে। ইসলামের শত্রুদের, বিশেষ করে ক্যাথলিক গির্জার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরও এসব কীর্তিতে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ জন্যই যেকোনো আলোচনা বা সংলাপই হোক না কেন, সংলাপ-মিটিংয়ে একজন মুসলিম আলোচককে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। শত্রুদের গভীর ষড়যন্ত্র ও কুদৃষ্টির বলি যেন না হয় ইসলামের দাওয়াতি কর্মপন্থা। এই গভীর ফাঁদে পা রেখে যেন মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে চলে না যাওয়া হয়। কোনো পর্যায়ে নিজেদের পরিচয়, স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য থেকেও যেন হাত গোটাতে না হয়। বোঝানোর পরিবর্তে স্বয়ং নিজেই ভীত হয়ে ইসলামের ঐতিহ্যকে নিঃশেষ করার পথই যেন অতিক্রম করতে না হয়। আল্লাহ তা'আলা এসব গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে মুসলমানদের হেফাজত করুন।

খুবই সতর্কতার সহিত, সম্পূর্ণ হুশজ্ঞান নিয়ে, শরীয়তে ইসলামের প্রতি অনন্ত ভালোবাসা রেখে, দ্বীনে ইসলামের সততা ও সত্যতার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই এই কাঁটাযুক্ত প্রান্তরে মুমিনদের কদম রাখতে হবে। তবেই আশানুরূপ পরিবেশ সুদৃঢ় হবে।

সংলাপের উদ্দেশ্য হলো, প্রতিপক্ষকে আশ্বস্ত করা এবং তার অন্তরে সৃষ্ট অভিযোগ-সংশয় দূর করা। এটিকে ইফহাম, তাফহীমও (বোঝাপড়া) বলা হয়। এর কাছাকাছি শব্দ হলো মুনাযারাহ (তর্ক)। যাতে প্রতিপক্ষের প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়া হয়। এটি জরুরি নয় যে প্রতিপক্ষ এতেই স্বস্তি লাভ করবে। কোনো কোনো সময় মুনাযারা ফলপ্রসূ হয়। হক্বকে হক্ব ও বাতিলকে বাতিল প্রমাণিত করার জন্য এটি একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় পন্থা। আমাদের আকাবিররা ও এই মাঠে কদম রেখে ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষাকে সমুন্নত করেছেন। তাঁদের এই তার্কিক কৃতিত্বও যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের মুখে চর্চিত ছিল। এসব চর্চা হ্রাস পেয়ে এখন কিতাবী ভূষণে পরিণত হয়েছে। আকাবিরদের এই অমূল্য আমলী ময়দান তথা মুনাযারা এখন সংলাপের ময়দানে বক্তব্যের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে। বরং বাতিলকে ফুঁসিয়ে তোলা বা উসকানি দেওয়ার কাজে সহযোগী প্রমাণিত হচ্ছে। এই কারণে সংলাপ এবং পরস্পর মতবিনিময়ের পথ গ্রহণ করা হচ্ছে এই মুনাজারা পদ্ধতি। এর উপকার ও ক্ষতির দিকে যাব না। তবে এর মাধ্যমে রোগাক্রান্ত সমাজের ভুল-মানসিকতা থেকে অন্তর অনেকটাই পরিষ্কার হয়, বাস্তবতাকে গ্রহণ করে নেয়। যদিও সেটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে

দ্বিধা বাকি থাকে।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অবগতদের কাছে এটা অজানা নয় যে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে ইফহাম, তাফহীম তথা (বোঝাপড়ার) ওপর অনেক জোর-তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। ওহী নাজিল হওয়ার পরপরই এই কর্মপদ্ধতির সিলসিলা আরম্ভ হয়। মক্কার কাফেরগণ, বিশেষ করে নববী গোত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের সাথে রাসূল (সা.)-এর কথোপকথন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণকারীদের সামনে ইসলামের দাওয়াত, যার ফলে এই দ্বীনের পতাকাতলে এত লোকের সমাগম, এসবই مذاكره তথা সংলাপের সুবিস্তৃত অবদান। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে আরব জাতি যেসব সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছিল তা দূরীকরণে উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী এবং অন্য সাহাবীগণ পরস্পর সংলাপে খুবই সাহিত্যপূর্ণ ভাষাভঙ্গি দ্বারা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এটাকে সংলাপের বৈধতার ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এ বিষয়ে ইমাম বোখারী (রহ.) একটি লম্বা হাদীস নিয়ে এসেছেন। সেখানে হযরত ওরয়ার (রা.) বর্ণনা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন :

أَىْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى، فَإِنِّى وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّى لَأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ،

অর্থ : হে মুহাম্মদ একটু বলুন তো যদি আপনি নিজের কওমকে ধ্বংস করেই দেন তবে আপনি কোনো আরবী সম্পর্কে শুনেছেন কি? যে সে আপনার আগেই নিজের স্বজাতিকে সমূলে বিনাশ করে দিয়েছেন। যদি অবস্থা দ্বিতীয় প্রকারের হয় তাহলে আল্লাহর কসম আমি আপনার কাছে বিভিন্ন কওম ও গোষ্ঠীর লোক দেখছি। তারা আপনাকে ছেড়ে পালাবে, এমন মানসিকতা রাখে তারা। (বোখারী শরীফ-১/৩৭৮)

আমূল ওফূদ তথা ওফূদের বছর ইয়েমেনের খ্রিস্টানদের একটি দল রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলো। যা ওয়াফদে নাজরান (নাজরানের প্রতিনিধিদল) হিসেবে প্রসিদ্ধ। এরা ছিল আহলে কিতাব। তারা রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছে। তারা মসজিদে নববীতে কা'বা শরীফের দিকে চেহারা না ফিরিয়ে বাইতুল্লাহামের দিকে রুখ করে নিজেদের ইবাদতও আদায় করেছে। আল্লাহর হাবীব রাসূল (সা.) তাদের নিষেধ করতে সাহাবাদেরকে বারণ করেছেন। কারণ তাদের শরীয়তে এ রকমই ছিল। এ রকম আলোচনার ধারাবাহিকতা রাসূল-পরবর্তী যুগেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনো এর প্রচলন আছে। এটা অবশ্যই চিন্তা করা উচিত যে একজন মুসলমান অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে কী কী বিষয়ে আলাপ করতে পারবে। এই আলোচনা আপন গন্তব্য ও সঠিক স্থানে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? এবং কোন পন্থা অবলম্বন করলে বেশি বেশি মানুষের কাছে ইসলাম ও পবিত্র ইসলামী শিক্ষার দিকে আসক্ত করে তাদের হৃদয়ে নাড়া দেওয়া যায়? এসব বিষয়ে প্রয়োজন গবেষণার। চিন্তা চেতনায় দৃঢ়তার।

সংলাপের বিষয়বস্তু

যেহেতু আলোচনা বা সংলাপের উদ্দেশ্য দাওয়াত ও তাবলীগের পরিবেশ সৃষ্টি করা, ইসলাম ও ইসলামী বিধানাবলি সম্পর্কে পরিকল্পিতভাবে প্রচারিত ভয়ভীতি দূরীকরণ, ভুল-বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্ট অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সংশোধন, সত্যকে বোঝানো এবং হক্কের সঠিক ব্যাখ্যা অন্তরে প্রোথিত করা সে কারণে সংলাপের বিষয়বস্তু হবে খালেস ধর্ম বিষয়ক। মক্কার কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে রাসূল (সা.)-এর যে আলোচনা বা সংলাপ হয়েছিল, তাতে কাফেরদের নিয়্যাত যেটিই হোক না কেন কিন্তু এই সংলাপে রাসূলের অংশগ্রহণ ছিল একমাত্র বোঝানো ও সমজানোর উদ্দেশ্যেই। একবার তো রাসূল (সা.) অনেক তাড়াহুড়া করে এমন বৈঠকে পৌঁছেন যে মিটিংয়ে উতবা বিন রাবিয়াহ, শাইবা বিন রাবিয়াহ, আবু সুফিয়ান বিন হারাব, নজর বিন হারিস, আবুলবুখতরী বিন হিশাম, আসওয়াদ বিন মুততালিব বিন আসাদ, যামআহ বিন আসওয়াদ, আবু জাহাল, উমাইয়া বিন খলফ ছাড়াও কুরাইশের অনেক মান্যগণ্য নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাই রাসূল (সা.)-কে সংলাপের জন্য ডেকেছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁদের দাওয়াতের সংবাদ পাওয়ামাত্রই তাড়াতাড়ি মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তাঁরা নিজেদের কথাগুলো মিটিংয়ে উপস্থাপন করলেন। তাঁরা এভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরলেন : আপনি আপনার এই দাওয়াতের মাধ্যমে পুরো জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সবার আশা-আকাঙ্ক্ষায় পানি ঢেলে দিয়েছেন। বাপ-দাদার ধর্মের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। অবশেষে আপনার উদ্দেশ্য কী? যদি আপনার ধন-সম্পদ ও অর্থ উপার্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটির ব্যবস্থা এমনরূপে করব যে আমাদের মাঝে আপনিই সবচেয়ে বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত থাকবেন। যদি আপনার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব হয়ে থাকে তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের সর্বোচ্চ সম্মানী নেতা মেনে নেওয়ার জন্যও তৈরি আছি। যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় কোনো সুন্দরী মহিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন তাহলে আমরা এর জন্য চেষ্টা করব। এমনকি আপনার ওপর কোনো জাদুটোনার আসর পড়ে

থাকলে আমরা সবাই মিলে এর চিকিৎসা করব।

তাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের মাঝে বাস্তবে ভুল-বোঝাবুঝি ও ভুল ধারণা ছিল, নচেৎ তাঁরা জেনেশুনে এমন বানোয়াট কথাগুলো উপস্থাপন করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁদের এই ভুল ধারণা ভাঙার জন্য ইরশাদ করেন :

ما بى ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به اطلب اموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثنى اليكم رسولا، وانزل على كتابا، وامرنى ان اكون لكم بشيرا ونذيرا

অর্থ : আপনারা যেসব বললেন, এ রকম কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি আপনাদের কাছে অর্থসম্পদের জন্যও আসিনি, না আমার নেতৃত্ব উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাকে আপনাদের কাছে রাসূল (আল্লাহর দূত) হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আমার ওপর কিতাব (আল কোরআন) অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে আমি যেন আপনাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী ও জাহান্নাম থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী হই। এ রকম আরো অনেক সংলাপের কথা উল্লেখ আছে, যেগুলো দ্বারা দ্বীনি বিষয়ে সংলাপ বা আলোচনার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই দ্বীনি সংলাপ একটি কাঁটাবিশিষ্ট প্রান্তর। এখানে খুবই সতর্কতার সহিত চলা দরকার। না এখানে সকল শ্রেণীর ব্যক্তির প্রবেশের অনুমতি আছে, না সর্বদা শুধু সংলাপ সংলাপ বলে স্লোগান দিয়ে মূল দাওয়াতি মিশন থেকে দূরে সরে থাকার এখতিয়ার আছে। তাই–

(ক) এই সংলাপে যাঁরা অংশ নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে ইসলামের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে পারদর্শী এবং আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। অন্যথায় নিজেরাই যদি এগুলোর প্রতি পুরোপুরি পারদর্শী ও আস্থাবান হতে না পারে তাহলে তারা অন্যকে কিভাবে আস্থাবান বানাবে। ঘুমন্ত ব্যক্তি অন্য ঘুমন্ত ব্যক্তিকে কিভাবে জাগ্রত করবে? আল্লাহ না করুন যদি প্রতিপক্ষের পাল্লা ভারী হয়ে পড়ে সন্দেহ ও সংশয় দ্বারা মানুষের অন্তরকে বিভ্রান্ত করে ফেলে তখন সংলাপের ফায়দা-উপকার তো দূরের কথা বরং তার উল্টো প্রভাবই সমাজে বিস্তৃত হবে।

(খ) এটাও উচিত যে যাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, তাদের কাছে যে কিতাবগুলো স্বীকৃত বা গ্রহণযোগ্য ওই কিতাবের কমপক্ষে ওই অংশের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করা, যা আমাদের শরীয়ত ও দ্বীনের সঙ্গে মিল রয়েছে। বরং তা দ্বারা দ্বীন ও ঈমানের জন্য সহায়ক হয়, যাতে করে সময়-সুযোগ বুঝে এগুলো পেশ করা যেতে পারে। কারণ বাস্তবতা হলো এই, এতগুলো পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এখনো ওই কিতাবগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ বিশাল অংশ এমনও আছে, যেগুলো ইসলামের সমর্থনের জন্য যথেষ্ট। এমনকি হিন্দুদের ধর্মীয় কিতাব গিতা, রামায়ন, বেদ ইত্যাদিতে অনেক ধারা এ বিষয়ে পাওয়া যায়।

(গ) এটাও দরকার যে সংলাপ শুধু প্রচলিত ফ্যাশন হিসেবে না হয়, আত্মগর্ব বা নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্যও যেন না হয়। অন্যথায় সেটি দ্বীন হবে না বরং দুনিয়া হবে। উপমহাদেশে কিছু শতাব্দী পূর্বে আবুল ফজল, ফয়জী আব্দুল্লাহ সোলতানপুরী, মোল্লা মোবারকদের মতো আলেমদের তর্ক-বিতর্ক, তাঁদের আত্মগর্ব ও বড়ত্ব এবং লোকদেখানো কর্মকাণ্ড ইসলামের এই পুতঃ পবিত্র শস্যাগারকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে "দ্বীনে ইলাহি" নামক একটি নাপাক নেজাম বা অপবিত্র ব্যবস্থাপনার জন্ম দিয়েছিল। যা সংশোধন করার লক্ষ্যে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী এবং তাঁর সহকর্মীদেরকে কত জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এক দীর্ঘ সময় অতিক্রম হওয়ার পর বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেবের যুগে এসে পুনরায় সঠিক ইসলামের বিস্তার ঘটতে শুরু হয়। এ কারণেই সুস্থ আবেগ, পূর্ণজ্ঞান, আস্থা ও বিশ্বাস, শক্তিশালী ঈমান ও আমল দ্বারা সজ্জিত হয়ে সংলাপে অংশ নিতে পারলে তখনই হবে এই সংলাপ উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সঠিক ফলপ্রসূ।

অন্যের সমালোচনার সীমা :

শিরিকি আমল এবং গোনাহের কাজের ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য কোনো সমঝোতা করা কখনো সম্ভব নয় বরং সংলাপ-সমঝোতার উদ্দেশ্য হলো তাঁদেরকে এমন আমল থেকে রুখে রাখা এবং একটি উদাহরণতুল্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। তবে দাওয়াতি নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতিকে ভুলে গেলে চলবে না।

(ঘ) দাওয়াতের কাজ শুধু আদেশ শোনানোই নয় বরং এই আদেশের ওপর আমলের দিকে ডাকা বা তার প্রতি উৎসাহিত করা। অতএব ডাকার যে রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন রয়েছে এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে। দাওয়াত ওই সময় প্রভাবিত করে সম্বোধনকৃত ব্যক্তিদেরকে যখন দাওয়াতের পদ্ধতি দ্বারা তাদের অন্তরে আতঙ্ক ও বিষণ্নতা সৃষ্টি না হয়। তাতে কোনো প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপের দিকও থাকতে পারবে না। অন্যথায় শ্রোতা শুরু থেকেই বিমুখ হয়ে যাবে। একই সাথে অন্যের বিদ্রূপের জবাবে উত্তেজিতও হওয়া যাবে না।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের শান এ রকমই ছিল। মানুষের পক্ষ থেকে কতই যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, দ্বীন ও মাযহাবের প্রতি কতই প্রতিহিংসামূলক বাক্য ছোড়া হয়েছে, নবীদের জাতের ওপর পর্যন্তও হামলা করা হয়েছে, নূহ (আ.)-এর কওম নিজেদের নবীকে

সম্বোধন করে বলেছেন, انا لنراك فى ضلال مبين- আমরা আপনাকে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পাচ্ছি। কিন্তু পয়গাম্বরের জবাব ছিল এই,

يٰقوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العلمين-

হে আমার জাতি! আমি কোনো গোমরাহ নই, আমি রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে একমাত্র দূত এবং রাসূল।

হযরত হুদ (আ.)-এর কওমের কথাগুলো কত কষ্টদায়ক ছিল। তারা বলে,

انالنراك فى سفاهة وانالنظنك من الكاذبين-

অর্থাৎ আমরা তো আপনাকে নির্বোধ মনে করি। আমাদের মনে হয় আপনি মিথ্যাবাদীদের মধ্য থেকে একজন। হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে তো ফেরাউন ও তার কওম সীমালঙ্ঘন করেছে। ফেরাউন বলে, রাববুল আলামীন কে? মহান আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর যখন رب السماوات والارض আসমান-জমিনের রব বলে স্বীয় সঠিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তখন ফেরাউন বিদ্রূপ করে বলেন, الا تسمعون؟ হে লোক সকল! তোমরা কি শুনতে পারছ? এ কেমন জ্ঞানহীন কথা বলে? হযরত মুসা (আ.)-এর অন্তরে এর কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি এবং তিনি এতটুকু বলেছেন,

ربكم ورب آبائكم الاولين-

তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদার প্রতিপালকও একমাত্র তিনিই। তখন ফেরাউন তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলে,

ان رسولكم الذى ارسل اليكم لمجنون-

তোমাদের রাসূল তো নির্বোধ-পাগল মনে হচ্ছে। কিন্তু পয়গম্বর (আ.) এগুলোর কোনো তোয়াক্কা না করে বলেন,

رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنتم تعقلون-

তিনিই একমাত্র পূর্ব-পশ্চিম ও এর মাঝখানে যা কিছু আছে সবারই প্রতিপালক, যদি তোমাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান থাকে।

সর্বশেষ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এই দাওয়াতের মাঠে কত কিছু বলা হয়েছে। কোনো কোনো সময় বলা হয়েছে জাদুকর, পাগল আবার কোনো কোনো সময় কবি, গণক ইত্যাদি বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু নবী কারীম (সা.) কখনো বিদ্রূপের জবাব বিদ্রূপ দ্বারা দেননি বরং আদর ও ভালোবাসা দিয়েই দিয়েছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ফলাফল খুবই ক্ষতিকর প্রমাণ হয়, এটি ফিতনার দরজা খুলে দেয়। কোরআন মাজীদ এ রকম প্রতিঘাতমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করতে শক্তভাবে নিষেধ করেছেন।

ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبو الله عدوا بغير علم-(انعام: ১০৮)

অর্থ : তারা (কাফেররা) আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা বা পূজা করে তাদের গালমন্দ করো না, তারা না বুঝে আল্লাহকেও বেয়াদবিমূলক গালমন্দ করবে। (আনআম ১০৮)

বিখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা জাস্সাস লেখেন, এই আয়াত দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে আহলে হকের জন্য জরুরি হলো ওই নির্বোধদের গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকা, যারা বিমুখ-বিদ্বেষ প্রবণ হয়ে অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহকে গালমন্দ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। কারণ এটা হবে গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করার সমার্থক। (আহকামুল কোরআন-৩০/৯)

মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন, উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ সব সময়ের জন্য স্থায়ী থাকবে। সুতরাং কাফেররা শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হয় এবং এই আশঙ্কা থাকে যে তারা ইসলাম অথবা নবী (আ.) অথবা আল্লাহ তা'আলাকে কটাক্ষ করবে, তখন তাদের ক্রুশ, ধর্ম এবং উপাসনা নিয়ে কোনো মুসলমানের জন্য মন্দ বলা বা কটাক্ষ করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে এমন কোনো আচরণ না করা, যা উল্লিখিত খারাবি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ এগুলো হলো গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করার সমর্থক। (আল জামি লিআহকামিল কোরআন-৪/২৮)

(২) কোরআন মাজীদ দাওয়াতের বিধানের ক্ষেত্রে "হিকমতের" প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। হিকমতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা হলো, যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেগুলোর ভিত্তি হবে প্রকৃত ও বাস্তব এবং হৃদয়গ্রাহী দাওয়াতি পদ্ধতি গ্রহণ করা। অন্তরে এর প্রভাব বিস্তারের জন্য পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি শ্রেণী লোকের সাথে একই পদ্ধতির কথা বলা যাবে না। কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকবে পরকাল আর সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, কেউ থাকবে অবিশ্বাসী। কেউ থাকবে নিখুঁত বস্তুবাদী। যারা আখিরাত আছে বলে বিশ্বাসও করে না। স্রষ্টার অস্তিত্বও স্বীকার করে না। মনমানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায়ও অনেক ভিন্নতা থাকবে। কেউ হবে গোড়া কট্টরপন্থী উগ্রতার রোগে আক্রান্ত। কেউ থাকবে সাদাসিধা, সরলমনা, ভদ্র।

মোটকথা, সর্বপ্রথম সময়ের চাহিদা এবং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি। অতঃপর যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন, সেখানে কঠোরতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু যেখানে নম্র-ভদ্র ভাষা দিয়ে কাজ হয় সেখানে অবশ্যই নম্রতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যথাসম্ভব

কঠোরতা না করে শালীন, নম্র-ভদ্র ভাষায় ভালোবাসাপূর্ণ সদাচরণ এখতিয়ার করবে। এ রকম সংলাপ বা আলোচনার ক্ষেত্রে কোরআন মাজীদে "উত্তম পন্থা" অবলম্বন করতে বলা হয়েছে :

ولاتـجـادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن۔

"আহলে কিতাবের সাথে আলোচনা (তর্ক-বিতর্ক) উত্তম পদ্ধতিতে করো।"

হযরত মুসা (আ.) এবং হারুন (আ.)-কে যখন ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছে, তখন বিশেষভাবে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে,

قولاله قولا لينا۔

"তাদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে নম্র ও ভদ্র ভাষা এখতিয়ার করবেন।"

এরূপ উত্তম পদ্ধতিতেই ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। ইসলামে দীক্ষিতদের সম্পর্কে যদি একটি সাধারণ জরিপও করা হয়, তবে স্পষ্ট হবে যে তাদের প্রভাবিত হওয়ার পেছনে কঠোরতার চেয়ে নম্রতা-ভদ্রতাই বেশি ভূমিকা পালন করেছে। কোরআন মাজীদ রাসূল (সা.)-এর বিশেষ গুণ হিসেবে নম্র ভাষা এবং উন্নত চরিত্রকেই চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কঠোরতার কোনো স্থান বা কোনো রাস্তাই নেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠোর ভাষাও ভূমিকা পালন করে থাকে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী এবং অন্যান্য আরব নেতাদের সঙ্গে রাসূল (সা.) যে সংলাপ করেছিলেন তাতে শেষের দিকে এই কথাও বলেছিলেন :

وَإِنْ هُـمْ أَبَـوْا، فَـوَالَّـذِى نَـفْسِـى بِيَـدِهِ لَأُقَـاتِـلَـنَّهُـمْ عَلَى أَمْرِى هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِى، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ

"যদি তারা অস্বীকার করে বসে তাহলে আল্লাহর কসম আমি এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব আমার মাথা শরীর থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ তা'আলার স্বীয় হুকুম বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত। (বোখারী শরীফ-১/৩৭৮)

অর্থাৎ যদিও তিক্ত ভাষা ও কঠোরতা অশোভনীয়, তথাপি অনেক সময় নরম কথা ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে। এতে দুশমনের লাগামহীনতা বৃদ্ধি পায়। তারা মনে করবে, মুসলমানগণ ভিতু এবং হয়তো সামনে তাদের কঠোর কোনো পদক্ষেপ নেই।

(৩) তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো "উত্তম নসীহত"। এর সরল ব্যাখ্যা হলো, শ্রোতাদেরকে যথাসাধ্য বোঝাতে হবে এটি কল্যাণেরই কথা, কল্যাণার্থেই বলা হচ্ছে। স্বার্থ হাসিল, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ এবং লোকদেখানোর জন্য নয়। এর সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। হযরত থানভী (রহ.) স্বীয় মালফূজাতে এটার ওপর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি উত্তম কথা হয়, কথার ধরন মার্জিত হয় এবং খালিস কল্যাণের নিয়্যাতে হয় তবে তাতে নিশ্চয়ই প্রভাব আছে।

তাই তাদের সামনে হকের ফাজায়েল এবং তার বিপরীতমুখী চললে যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে পারেন ওইগুলো ওহীর আলোকে বা যুক্তির আলোকে বর্ণনা করবেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতে বিভিন্ন জায়গায় يـاقومى "হে আমার কওম, হে আমার ভাই" বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে এতে এ রহস্য নিহিত যে শ্রোতাদের অন্তরে যেন এমন আস্থা-বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে আমার সাথে আলোচনাকারী ব্যক্তি আমাকে ভাই মেনে নিয়ে কথা বলতেছেন, যদি এ বিষয়ে তাদের কোনো বুযুর্গ এবং তাদের পবিত্র কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই সব কথাবার্তা তাদের সামনে রাখা যায়, সেগুলো ইসলামী শরীয়তের সাথে মিল রয়েছে তখন তাদের অন্তরে হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার ধারণা আরো শক্ত ও দৃঢ় হয়ে যাবে। রাসূল (সা.) রোমের বাদশাহর নিকট যখন দাওয়াতি চিঠি প্রেরণ করেছেন, যেখানে তাঁর সম্মান ও মান-মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। সেখানে একটি সর্বসম্মত বিষয় উল্লেখ করে তাঁকে নিকট বা কাছে আনার চেষ্টা করেছেন।

(৪) হারকে মেনে নেওয়া : যদি অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে কোনো হক কথা এসে যায় তবে তার পুরোপুরি অভ্যর্থনা জানানো সেই সাথে উদার চিন্তা-চেতনার মনমানসিকতা প্রকাশ করে তাকে অন্তর থেকে কবুল করে নেওয়া। এতে করে হক কবুল করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

(৫) সংলাপ যদি কোনো কারণে ফলপ্রসূ না হয় তখন এ রকম স্থানে/বা এমন সময় খুব গম্ভীরতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। অনর্থক অপবাদ দিয়ে, বা দোষারোপ থেকে বেঁচে থেকে لـكـم دينـكـم ولـى دين (তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আমার ধর্ম আমার জন্য) এর আশ্রয় নিয়ে সমস্ত কথাবার্তা বা বিষয়গুলো সংরক্ষণ করে রাখা, যাতে করে ভবিষ্যতে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ রেখে সংলাপ-আলোচনা করলে ইনশাআল্লাহ সংলাপও পরস্পর আলোচনা চাহিদা অনুযায়ী ফলপ্রসূ হতে পারে, অন্যথায় সংলাপ হতেই থাকবে; কিন্তু সমস্যা যেখানে, সেখানেই রয়ে যাবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সুড়ঙ্গের ফাঁক মারার জন্য মরিয়া হয়ে থাকবে; কিন্তু এই ফাঁক দ্বারা দুনিয়া তো দূরে থাক, আশপাশেও কোনো আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারবে না।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি কোন পথে?

মাওলানা শরীফ উসমানি

সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিগুলো অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিল যে আগের মতো উপনিবেশ কলোনি টিকিয়ে রাখা এখন আর সম্ভব নয়। তাই তারা নতুন পলিসি হাতে নেয়। সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা অনুযায়ী, তারা বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ভিতের সমূলে কুঠারাঘাত করে। এটা সর্বজনবিদিত যে কোনো জাতির নৈতিক অধঃপতন হলে সে জাতির জাতিসত্তাই ধীরে ধীরে লীন হতে থাকে। ব্রিটিশরা কয়েক শ বছর ধরে চলে আসা উপমহাদেশের শিক্ষানীতি বাতিল করে দিয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। এ শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পড়ে লর্ড মেকলের ওপর। ওই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কী? এর বর্ণনাও পাওয়া যায় মেকলের জবানে। ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লর্ড মেকলে বলেন, 'আমি ভারতবর্ষের (বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোথাও একজন ভিক্ষুকও আমার চোখে পড়েনি, একজন চোরও আমি দেখতে পাইনি। এ দেশে সম্পদের এত প্রাচুর্য এবং এ দেশের মানুষগুলো এতটাই যোগ্যতাসম্পন্ন ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যে এ দেশকে আমরা কখনোই পদানত করতে পারব না, যদি না তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলতে পারি। এ দেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই হচ্ছে সেই মেরুদণ্ড। এ কারণে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা এখানকার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এমন একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করব, যাতে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ভাবতে শেখে যে যা কিছু বিদেশি ও ইংরেজদের তৈরি, তা-ই ভালো ও নিজেদের দেশের থেকে উৎকৃষ্টতর। এভাবে তারা নিজেদের ওপর শ্রদ্ধা হারাবে, তাদের দেশজ সংস্কৃতি হারাবে এবং এমন একটি পরাধীন জাতিতে পরিণত হবে, ঠিক যেমনটি আমরা চাই।'

(https://goo.gl/g8HmDC)

লর্ড মেকলের এই ভাষণ স্বামী বিবেকানন্দের Saving Humanity বইয়ের ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে।

লর্ড মেকলের মিশন বাংলাদেশে কতটা সফল হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় লেখক জেমস জে. নোভাকের লেখায়। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর এশিয়ায় ছিলেন। উপমহাদেশের অজস্র স্থান ভ্রমণ করেছেন। তিনি একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম :

BANGLADESH REFLECTIONS ON THE WATER.

তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, 'বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির অনেক আচার-প্রথা এমনভাবে ঢুকে গেছে যে তা থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করা যাবে না। বিচারক পরচুলা পরেন এখানে সেই ব্রিটিশ অনুশাসনের জন্যই। জেনারেলরা হতে চান 'ফিল্ড মার্শাল'। সেটা একটা ব্রিটিশ আকাঙ্ক্ষা। সিভিল সার্ভিসের অভিধাগুলোও ব্রিটিশদের অনুরূপ। এককথায়, বাংলাদেশ তার ঔপনিবেশিক প্রভু থেকে সিভিল ও সামরিক–এই দুই প্রতিষ্ঠানের সবকিছু অনুসরণ-অনুকরণ করেছে। এটা তাদের উত্তরাধিকার।'

তিনি আরো লিখেছেন, 'কখনো কখনো মনে হয়, বাংলাদেশের অবস্থান যেন ঠিক 'এশিয়াতে'ও নয়, ভারত উপমহাদেশেও নয়, মাঝামাঝিতে। একটা জিনিস খুব কৌতুকাবহ মনে হয়, তা হলো, বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে ব্রিটিশ আমলের নিদর্শন খুব বেশি নেই। তার কারণ হয়তো এই যে বাংলাদেশে ব্রিটিশ পর্ব এখনো অব্যাহত আছে!"

বর্তমানে চিন্তা, আদর্শ, লাইফস্টাইল ও সংস্কৃতিতে বাঙালি মুসলমানের জীবনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এসেছে।

ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত বাঙালির জীবনাচারে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লর্ড মেকলের উত্তরাধিকারী সেই 'দোভাষীদের' কল্যাণে আমরা একটি নতুন শব্দ পেয়েছি। শব্দটি হলো 'জেনারেশন গ্যাপ'। এর হাকিকত আড়াল করে তথাকথিত প্রগতিশীল মিডিয়া 'জেনারেশন গ্যাপ' বলতে শুধু মা-বাবার সঙ্গে সন্তানদের দূরত্বের কথা উল্লেখ করে থাকে। তাদের মতে, নতুন প্রজন্ম ও পুরনো প্রজন্ম পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ করতে না পারাটাই 'জেনারেশন গ্যাপ'। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'জেনারেশন গ্যাপ' হলো, এক প্রজন্মের শিক্ষা, আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আরেক প্রজন্মের মধ্যে প্রজন্মান্তরিত না হওয়া। মুসলিম সমাজে এই 'জেনারেশন গ্যাপ' তৈরি করে দেওয়া হয়েছে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে। 'জেনারেশন গ্যাপ' সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো, ভাষা পরিবর্তন করে দেওয়া। ভাষার মাধ্যমে ভাব ও মূল্যবোধ প্রবাহিত হয়। ভাষা পরিবর্তিত হলে পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে 'জেনারেশন গ্যাপ' তৈরি হয়। ব্রিটিশরা এ কাজটি করেছিল সুকৌশলে। তারা প্রথমে আরবি-ফারসি ভাষা নিষিদ্ধ করে

ইংরেজি ভাষা চালু করে। আরবি-ফারসি ভাষা নিষিদ্ধ করায় ১১০০ বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধ প্রজন্মান্তর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এর ফলে বাঙালি মুসলমান এখন শুধু ইংরেজদের মতো পোশাক, হেয়ার স্টাইল, ক্লিন শেভ, স্যুট-টাই-ই ধারণ করে না, তাদের এখন খাঁটি ইংরেজ হওয়ার স্বপ্ন পেয়ে বসেছে। বাংলাদেশের অবস্থা এখন এমন : এ দেশে যে যত বেশি শিক্ষিত বা প্রভাবশালী, তার সন্তান তত বেশি নামিদামি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালেখা করে। টাকা-পয়সা একটু বেশি হলে স্বদেশে সন্তানদের শিক্ষিত করার গরজও তারা অনুভব করে না।

'আস্সালামু আলাইকুম' না বলে 'শুভ সকাল' কিংবা 'শুভ সন্ধ্যা' ইত্যাদি বলা এখন পুরনো ঐতিহ্য। নতুন ঐতিহ্য হলো 'গুড মর্নিং ও গুড নাইট'। নতুন প্রজন্মের মধ্যে যেন সূর্যবিদ্বেষ পেয়ে বসেছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, অনেকের সূর্যের প্রথম আলো দেখার সুযোগ হয় না। বাঙালি মুসলমান এখন আর 'ইন্তেকাল' করে না, 'মৃত্যুবরণ' করে। মৃত্যুর পর বাঙালির 'লাশ' এখন 'মরদেহ' হয়ে যায়। বাঙালি মুসলমানের 'মরদেহ' এখন 'কবরস্থ' হয় না, 'সমাধিস্থ' হয়। বাঙালি মুসলমান এখন কবর জিয়ারত করে না, 'এক মিনিট নীরবতা' পালন করে। সমাধিসৌধে গেলেও তারা সূরা ফাতেহার পরিবর্তে ফুল দিয়ে মৃতদের স্মরণ করে।

বাঙালি এখন পহেলা বৈশাখে দেনা-পাওয়া পরিশোধ করে না, 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বের করে।

বাঙালি মুসলমানের এক শ্রেণির মানুষের কাছে সন্তানের আরবি-ফারসি নাম বাঙালিত্বের অন্তরায়। তাই তারা তাদের বাংলায় নাম রাখতে শুরু করেছে। একজনের নাম 'প্রথম', আরেকজনের নাম 'দ্বিতীয়'। আমাদের পরিচিত একজন তাঁর ছেলের নাম রেখেছেন 'ইচ্ছা'।

এখন আর কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের সন্তানের সকাল শুরু হয় না। মক্তবকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন তাঁদের দৃষ্টিতে সেকেলে। বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে মসজিদে যাওয়ার গরজ এখন আর অভিভাবকরা অনুভব করেন না। মা-বাবা এখন আর সন্তানের অভিভাবক নন, বন্ধু। ফলে সন্তানদের শাসন করার পরিবর্তে তাঁরা বন্ধুসুলভ পরামর্শ দেন।

মা-বাবার সঙ্গে বউ-বাচ্চা নিয়ে যৌথভাবে থাকার প্রথা বাঙালি বহু আগেই অতিক্রম করেছে। এবার তারা মা-বাবাকেই ত্যাগ করতে শুরু করেছে। বছরের পর বছর মা-বাবাকে একটু দেখার ও কিছু অর্থকড়ি দেওয়ার সৌভাগ্য বহু বাঙালি মুসলমানের হয় না।

বাঙালি মুসলমানের সন্তানদের যৌনজীবনের গঠনপ্রক্রিয়া স্কুল-কলেজজীবনেই শেখা হয়ে যায়। তাই এখন বিয়ের জন্য অপেক্ষা করা বোকামি। 'গার্লফ্রেন্ড', বয়ফ্রেন্ড' তো থাকতেই পারে, তাই না?–এমন প্রশ্ন 'সাহসী' বাঙালি তরুণীরা হরহামেশাই ছুড়ে দেয়।

'বিয়ে করলে সংসার করতে হবে'–আধুনিক বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টিতে এমন ধারণা প্রগতিবিরোধী। তাই শুধু ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায়ই প্রতিদিন গড়ে ৫০ থেকে ৬০টির মতো বিচ্ছেদের আবেদন জমা হচ্ছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন দক্ষিণ ও উত্তরের তথ্যানুযায়ী, ২০১০-২০১৬ সাল পর্যন্ত রাজধানীতে তালাকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫২ হাজার। শহরে বাড়ছে একাকী মায়ের সংখ্যা। পারিবারিক কাঠামো প্রচণ্ড হুমকির মুখে।

বাঙালি মুসলমানের নতুন প্রজন্ম মুরব্বিদের দেখলে সালাম দেওয়া, চেয়ার ছেড়ে দেওয়ার ধার ধারে না। বাঙালি মায়েরাও এখন 'একটু সুখের আশায়' সন্তানদের খুন করতে শিখেছে। বাঙালি মুসলমানের সন্তানরা মাতা-পিতাকে খুন করার স্পর্ধাও ইতিমধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে।

যে বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলিম -নির্বিশেষে নারীরা শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করত, কঠোর পর্দাপ্রথা মেনে চলত, তাদের সন্তানরা এখন জিন্স ও টি-শার্টে আধুনিকতা খুঁজে বেড়ায়।

বাঙালির এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পেছনে শুধু যে ব্রিটিশদের গোলামি মার্কা শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী তা-ই নয়, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীও এর জন্য কম দায়ী নন। বুদ্ধিজীবিতার আড়ালে ভিনদেশি অর্থ নিয়ে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে একদল 'বুদ্ধিজীবী' কাজ করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে । যে দেশে ড. শহীদুল্লাহ, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, সৈয়দ আলী আহসানের মতো বুদ্ধিজীবী জন্ম নিয়েছেন, সে দেশে কারা আজ মুসলিম জাতির বিবেকের আসনে সমাসীন?

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় যে নৈতিক পচন ধরেছে, এ নিয়ে এসব বুদ্ধিজীবীর মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা এক জায়গায়–'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও রাষ্ট্রধর্ম কিভাবে সহাবস্থান করতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। সম্প্রতি কয়েকজন বুদ্ধিজীবী মহাগবেষণা করে বের করেছেন যে 'সম্ভাষণ, বিদায়সহ দৈনন্দিন নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কথাবার্তায় আরবি শব্দের ব্যবহার বাড়ছে। নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিজাব, নেকাব পরা এবং ছেলেদের মধ্যে ওয়াহাবি মতাদর্শ অনুসরণকারীদের মতো গোড়ালির ওপর প্যান্ট পরার প্রবণতা বাড়ছে।'

গত ১৬-১২-২০১৭ বিতর্কিত একটি জাতীয় দৈনিক 'বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রভাব প্রকট' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন ছাপে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ, অধ্যাপক আমেনা মহসিন ও অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন যৌথভাবে গবেষণাটি করেছেন।

তবে ওই বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি বলা ও ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ার প্রবণতা খুঁজে পাননি। হাজারো জিন্স ও টি-শার্ট পরা তরুণীর ভিড়ে তাঁরা ইউরোপীয় দুরবিন দিয়ে গুটিকয়েক হিজাবধারী তরুণীকে দেখে বেজায় বেজার। ঘর থেকে বের হলে তরুণ প্রজন্মের যে ইউরোপীয় স্টাইলের জীবনাচার চোখে পড়ে, তাতে অনেকের দ্বিধা হয়, এটা কি আদৌ বাংলাদেশ, নাকি ইউরোপের কোনো দেশ। বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এ দেশের ৯০.৬ ভাগ মানুষ মুসলমান। তাই এ দেশের মানুষের সংস্কৃতি ইসলামী মূল্যবোধ আশ্রয়ী হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রিটিশদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা ও তাদের অর্থ-মদদপুষ্ট মিডিয়া সেই মূল্যবোধ ধ্বংস করার জন্য বছরের পর বছর ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

গোড়ালির ওপর প্যান্ট পরা পনেরো শ বছরের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত। মহানবী (সা.)-এর এই সুন্নাত সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

مَاأَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِفَفِى النَّارِ

অর্থ : (পুরুষের) লুঙ্গি বা পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে, তা (জাহান্নামের) আগুনে প্রজ্জ্বলিত হবে।' (বোখারী, হাদীস : ৫৭৮৭)

অন্য হাদীসে এসেছে,

عن أبى هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاينظرالله يوم القيامةإلى من جرإزاره بطرا

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে তার লুঙ্গি বা পরিধেয় বস্তু অহংকারবশত প্রলম্বিত করে।' (বোখারী, হাদীস : ৫৪৫১)

মহানবী (সা.)-এর সুন্নাতকে ওয়াহাবি আদর্শ আখ্যায়িত করা শুধু কি অজ্ঞতা, নাকি ধৃষ্টতাও! আর হ্যাঁ, কাপড় একটু ওপরে উঠলে সেটি যদি উগ্রতা হয়, তাহলে ছোট ছোট ড্রেস, আবেদনময়ী নামসর্বস্ব পোশাক নিশ্চয়ই সমধিক উগ্রতার পরিচায়ক! তাহলে এই গবেষকরা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন যে বর্তমানে যে প্রগতি ও আধুনিকতার নামে যে বেলাল্লাপনা চলছে, সেটা চরম উগ্রতার পরিচায়ক, যে উগ্রতা উসকে দিচ্ছে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা!

এসব বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কে এম আর আখতার মুকুলের একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি লিখেছেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বলতে হয়, সে আমলে বাংলার মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির নবজাগরণ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে। এই নবজাগরণের মোদ্দাকথাটাই হচ্ছে বশ্যতা মেনে নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল সুদৃঢ় করা।' (কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী)

শর্ট পোশাক পরা ফ্যাশন হাউস ও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলোর হালচাল কী? হলিউড রিপোর্টার ডটকম আমাদের (১২-১১-২০১৭) জানিয়েছে, ৫৪ শতাংশের যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই জরিপ পরিচালনা করেছে, ইউকে টিভি ইন্ডাস্ট্রি। (সূত্র : https://goo.gl/XKuM9a)

বোদ্ধামহলের জানা থাকার কথা যে এখানে যে যৌন নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে, তা শুধু অসম্মতিপূর্ণ যৌন নির্যাতন! অন্যথায় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে 'গিভ অ্যান্ড টেক' (দাও এবং নাও) একটি কমন বিষয়। সেখানে পরস্পর সম্মতিপূর্ণ যৌনতা শুধু জায়েজই নয়, ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে জরুরি!

আচ্ছা, ফিল্মের কথা বাদ, আধুনিক কর্মজীবি নারীর খবর কী, ২১ অক্টোবর ২০১৭ বিখ্যাত সাময়িকি দ্য ইকনোমিক্সের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম হলো : An open secret : Sexual harassment at work.

অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন এখন ওপন সিক্রেট। (https://goo.gl/Ko94d6)

ভক্স নিউজ (১৫-১০-২০১৭) আমাদের জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে ৭৫ শতাংশ নারীরা কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার। (https://goo.gl/eKSgsD)

যুক্তরাষ্ট্রের হাফিংটনপোস্ট ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ আমাদের জানিয়েছে, প্রতি তিনজনে একজন নারী কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার। (https://goo.gl/xGJY9a)

যুক্তরাজ্যের টেলিগ্রাফ পত্রিকা ২৫-১০-২০১৭ আমাদের জানিয়েছে, প্রতি পাঁচজনে একজন নারী কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনের শিকার। (https://goo.gl/wEmWmU)

অন্যদিকে বাঙালি সাংবাদিক ও গবেষকদের গবেষণা দেখুন :

'বিবাহিত নারীদের ৮০ শতাংশ নির্যাতনের শিকার।' (প্রথম আলো : ৩ অক্টোবর ২০১৬)

ভাবখানা এমন, ঘর থেকেই বের করতে পারলেই নারীরা নির্যাতন থেকে রেহাই পাবে। যত সব সমস্যা নারীরা ঘরে থাকলে! অথচ প্রকৃত সত্য হলো, নারীকে ঘরের বাইরে আনতে না পারলে কর্পোরেট বাণিজ্য, অবাধ যৌনতা সম্ভব নয়। আবার ঘর থেকে বের হয়ে হিজাব, বোরখা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা মেয়েদের দিয়ে গোপন অভিলাষ

চরিতার্থ করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা হিজাব পরলে কামুকদের গা জ্বলে ওঠে।

২০১৪ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক ম্যাকস যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পোশাকের জায়ান্ট ক্রেতা আমেরিকান অ্যাপারেলসের মডেল হয়েছেন। আকর্ষণীয় ফিগারের এই নারীকে সম্পূর্ণ নগ্নবক্ষা করে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে আমেরিকান অ্যাপারেলস। এ নিয়ে সারা দেশে হইচই পড়ে যায়। তার নগ্ন বক্ষের ওপর লেখা ছিল, 'মেইড ইন বাংলাদেশ'। এ বিষয়ে সে সময় অর্থনীতিবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকা ড. জিনিয়া জাহিদ একটি কলাম লিখেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, 'একসময় মানুষ গাছের ছাল-পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখত। পোশাকবিহীন সেই সময়ের মনুষ্যজাতিকে অসভ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, মানুষের পোশাক সভ্যতার পরিচয় বহন করে। পোশাকের মধ্য দিয়েই মানুষ তার সংস্কৃতি, জাতীয়তা, ধর্ম, ব্যক্তিত্ব ও রুচির পরিচয় দিয়ে থাকে। কাজেই মানুষের জন্য পোশাক অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু নিজেদের সব চেয়ে সভ্যজাতি হিসেবে পরিচয় দানকারী দেশগুলো যখন নারীকে নগ্ন করে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তাকে তারা অসভ্যতা না বলে আধুনিকতা হিসেবে প্রচার করে থাকে। আর এই আধুনিকতার নগ্ন স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে নারীরাই নিজেদের সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে!!

পাশ্চাত্যে, এমনকি ভারতেও আজকাল মেয়েরা কোনো কিছু নিয়ে প্রতিবাদ করতে নগ্ন হয়ে যায়। ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যখন নারী নগ্ন হয়ে করে, তখন নারীর বুদ্ধির দৈন্যতা দেখে করুণা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে যখন নারী মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন পেটের দায়ে শরীর বিক্রি করা যৌনকর্মীদের সঙ্গে এদের আর কোনো পার্থক্যই থাকে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, নারী স্বাধীনতা, পুরুষের সমান নারীর অধিকার এসবের জন্য মুখের ফেনা তুলে আমরা নারীরা কি এই স্বাধীনতা চাইছি?'

প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি লিখেছেন, 'নগ্নতা আর যৌনতাই যদি হয় নারী স্বাধীনতা ও সমাধিকারের মাপকাঠি, তাহলে আমাদের নারীদের পুনরায় ভেবে দেখতে হবে আসলেই আমরা কেমন স্বাধীনতা চাই।' (ড. জিনিয়া জাহিদ, নগ্ন মডেল, একজন তসলিমা ও নারী স্বাধীনতা, বাংলানিউজ২৪ ডটকম : ৯-৩-২০১৪)

বিতর্কিত ওই জাতীয় দৈনিক যে প্রতিবেদন ছেপেছে, বাস্তবতা যে ঠিক তার বিপরীত, তা প্রমাণের জন্য কোনো ভাড়াটে গবেষণার দরকার হয় না। কেননা এটা দৃশ্যমান প্রমাণিত সত্য। এ দৃশ্য আস্তিক-নাস্তিক সবার কাছে চোখেই ধরা পড়ে। গত ২৪-১২-২০১৭ তারিখ তথাকথিক নাস্তিকদের অভয়ারণ্য 'ইস্টিশন' ব্লগে সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের অতিমাত্রায় দেহ প্রদর্শনের প্রবণতা সম্পর্কে একটি লেখা ছাপা হয়েছে।

লেখাটির শিরোনাম হলো, 'নারীর দেহ প্রদর্শনের প্রবণতা কিসের ইঙ্গিত?'

ব্লগটি লিখেছেন তানিয়া ফারাজী। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর মন্তব্য আমরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করি।

তিনি লিখেছেন, 'আমার মতে, যে নারী তার শরীরের বিভিন্ন অংশ অশ্লীলভাবে প্রদর্শন করছে, সে তা পুরুষদের উত্তেজিত করে তার প্রতি মনোযোগ আনার জন্যই করছে। এমন অবস্থায় যার মধ্যে মানবিক বোধ সৃষ্টি হয়নি, এমন কোনো খারাপ পুরুষ যদি উত্তেজিত হয়ে উক্ত নারীর সঙ্গে জোর করে যৌন সম্পর্ক করে ফেলে, তবে পুরুষটিকে দায়ী করার তেমন কিছু থাকে না, আর মেয়েটাকে নিষ্পাপ ভাবারও কিছু নেই। তাই এই ধরনের মেয়েদের প্রতি আমার সব সময় সমবেদনা কম।

...যে পুরুষ পরিবার থেকে, সমাজ থেকে সুশিক্ষা গ্রহণ করে মানুষকে সম্মান করতে শিখেছে, তারা নারীদের সঙ্গে কখনো অশালীন আচরণ করে না। সুশিক্ষিত, সভ্য পুরুষরা কোনো নারীকে একা কিংবা উলঙ্গ পেলেও ধর্ষণ করবে না; বরং লজ্জিত হবে। কিন্তু সুস্থ, সভ্য পুরুষদের মধ্যে সুস্থ যৌন রুচি সৃষ্টি এবং তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে নারীদের মুখ্য ভূমিকার কথা আজকাল আমরা অনেক নারীরাই ভুলে যাচ্ছি।'

তিনি আরো লিখেছেন, বর্তমানকালের নায়ক-নায়িকা এবং অতি আধুনিক নারী-পুরুষরা সমাজকে ভেতরে-বাইরে যৌন কারখানা বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। সুস্থ, স্বাভাবিক নারী-পুরুষের উচিত এই ধরনের নারী-পুরুষের বিষয়ে সচেতন থাকা এবং তাদের কুপ্রবৃত্তি প্রতিহত করা, যাতে তনুদের মতো সকল ভদ্র, পরিশ্রমী নারীরা হেসেখেলে বেঁচে থাকতে পারে ও ভদ্রভাবে পুরুষের দ্বারা মূল্যায়িত হতে পারে।' (ইস্টিশন)

বিতর্কিত ওই দৈনিকের বিরুদ্ধে প্রায়ই শোনা যায়, তারা নাকি ভিনদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে! দেশের গণতন্ত্র ধ্বংসেও তাদের ভূমিকা আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তথাকথিত মাইনাস টু ফর্মুলাও তাদের রচিত। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে এ পত্রিকাকে ২০০৭ সালে ক্ষমাও চাইতে হয়েছে। ওই পত্রিকা খুললেই শুধু নারী আর নারীর খবর। কে কার সঙ্গে প্রেম করল, লিভ টুগেদার করল, গর্ভপাত ঘটাল, এসব নিয়ে তাদের

(বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

লা-মাযহাবী মতবাদের স্বরূপ সন্ধানে

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

ভারতবর্ষে ইসলামের সূচনা থেকেই প্রায় সবাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। মুফতী, কাজি, বিচারক–সবই হচ্ছে এ মাযহাব থেকে। নামায, রোযা, ঈদ–সবই পালন হচ্ছে এ মাযহাবে বর্ণিত নিয়ম-নীতি অনুসারে। এসব বিষয়ে উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি অতীতে কখনো ছিল না বললেই চলে। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে সাম্প্রতিককালে কিছু মুসলমান বন্ধু বিভিন্ন এনজিও সংস্থার ছত্রচ্ছায়ায় সেবার নামে, অর্থবলে মুসলিম সমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করার, অশুভ পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। অবান্তর চ্যালেঞ্জসমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন, বই-পুস্তক ইত্যাদি বিনা মূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে সরলমনা জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি করছে মতভেদের নতুন নতুন আজগুবি উৎস। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আর হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণই তাদের আসল মিশন। তাই আমরা যদি বলি, পাখি আকাশে ওড়ে; তারা বলবে–না, পাখি সাগরে থাকে। যদি আমরা বলি, মাছ সাগরে থাকে; তারা বলবে–না, মাছ আকাশে ওড়ে। অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে এদের চরম বাড়াবাড়ির ফলে প্রায়ই সমাজে শান্তিভঙ্গের উপক্রম হচ্ছে। এ পর্যায়ে আমরা গভীরভাবে লক্ষ করে যাচ্ছি যে কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে অনুসৃত এবং মুসলিম বিশ্বে কিছু বিষয়ে তারা জনগণের মাঝে ধূম্রজাল সৃষ্টির বিভিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাস্তব অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা তালাশ করছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের আগ্রহ মূল্যায়ন করার লক্ষ্যেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আহলে হাদীস মতবাদের আবির্ভাব

বিশ্বের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমানই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসরণ করে। অবশিষ্ট শিয়া, রাফেযী ও আহলে হাদীস মতবাদসহ সব মিলিয়ে হয়তো শতকরা ৫ ভাগ হতে পারে। মাযহাব অবলম্বীদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আবার হানাফী মাযহাবের অনুসারী। হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.)-এর ইরশাদ, "হাশরের ময়দানে বেহেশতবাসীদের মোট ১২০টি কাতার হবে। তন্মধ্যে ৮০টি হবে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের। অবশিষ্ট ৪০টি হবে পূর্বেকার উম্মতের সমন্বয়ে।" [তিরমিযী-৪/৫৮৯ হা. নং ২৫৪৬]

মহানবী (সা.)-এর উম্মত যেমন অন্য সব উম্মতের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ হবে, তেমনিভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণও বর্তমান বিশ্ব মুসলিম জামা'আতে দুই-তৃতীয়াংশ হিসেবে গণ্য। আর ভারতবর্ষে তো ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে শুধু হানাফী মাযহাবেরই জয়জয়কার চলে আসছে। ১২৪৬ হিজরীর পূর্বে এ দেশে কথিত আহলে হাদীস মতবাদের কোনো অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। এদের অন্যতম মুখপাত্র নবাব ছিদ্দিক হাসান খান তাঁর রচিত "তরজুমানে ওহহাবিয়্যা" নামক গ্রন্থে লেখেন, "এ দেশে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সবাই হানাফী মাযহাবের ওপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। আলিম, ফাযিল, কাজি, মুফতী, বিচারক–এসব সুমহান দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গ এ মাযহাব থেকেই হয়ে আসছেন।" [পৃ. নং ১০]

"মুযাহেরে হক্ব" কিতাবের স্বনামধন্য লেখক মাওলানা কুতুবুদ্দীন তাঁর 'তুহফাতুল আরব ওয়াল আযম' গ্রন্থে কথিত আহলে হাদীস মতবাদের উৎপত্তি, আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এর সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হলো।

"সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও মাও. আব্দুল হাই (রহ.) পাঞ্জাবে আগমনের পরপরই কতিপয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীর সমন্বয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের অনুসরণ অস্বীকারকারী নতুন মতবাদটির সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। যারা হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর মুজাহিদ বাহিনীর বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্য ছিল, এদের মুখপাত্র ছিল মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী (মৃত ১২৭৫ হি.) তার এ ধরনের অসংখ্য ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) ১২৪৬ হিজরীতে তাকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বহিষ্কার করেন। তখনই গোটা ভারতবর্ষের সব ধর্মপ্রাণ জনগণ, বিশেষ করে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর খলিফা ও মুরিদগণ পবিত্র মক্কা-মদীনার তদানীন্তন উলামায়ে কেরাম ও মুফতীগণের নিকট এ ব্যাপারে ফাতওয়া তলব করেন। ফলে সেখানকার তৎকালীন সম্মানিত মুফতীগণ ও অন্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে মৌলভী আব্দুল হক ও

তার অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করেন এবং মৌলভী আব্দুল হককে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। মৌলভী আব্দুল হক বেনারস পলায়নকরত আত্মরক্ষা পায়। সেখানে গিয়ে তার নব আবিষ্কৃত দলের প্রধান হয়ে সরলমনা জনসাধারণের মধ্যে তার নতুন মতবাদ ছড়াতে থাকে। [তুহফাতুল আরব ওয়াল আযম খ. ২, পৃ. ১৬]

মক্কা-মদীনার উলামায়ে কেরামের এ ফাতওয়া ১২৫৪ হিজরীতে তান্বীহুদ্দাল্লীন শীর্ষক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। আজও দেশের ধর্মীয় লাইব্রেরিগুলোতে এর কপি সংরক্ষিত আছে।

আরব বিশ্বে লা-মাযহাবী মতবাদের সূচনা

সাম্প্রতিককালে আরব বিশ্বের কিছু স্থানে লা-মাযহাবীদের উগ্র তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমার উস্তাদ মদীনা ইউনিভার্সিটির জনৈক প্রফেসর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলছিলেন, আমার বাপ-দাদা কোনো দিন দেখেননি। শৈশবে আমাদের নজরে আসেনি। দেখতে পাইনি যৌবনকালেও এই লা-মাযহাবী মতবাদ। বর্তমানে শেষ যামানায় বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কিছু উদাসীন যুবক শ্রেণীর মধ্যে এ প্রবণতা লক্ষ করছি। বাপ-দাদারা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবাদের যুগ থেকে এভাবেই চলে আসছে। বাল্যকাল থেকে মক্কা-মদীনায় ২০ রাক'আত পড়ে আসছি। বর্তমানে ওই যুবকদের কিছুসংখ্যক আট রাক'আত তারাবীহ শেষ হলেই মুসল্লিদের ডিঙিয়ে পালিয়ে যায়। ইউরোপের আলবানিয়া থেকে শায়েখ নাসির উদ্দীন আলবানী, মৃত ১৯৯৭ ইং সৌদি আরবে আগমনের পর থেকে এ দেশে এই অপতৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। শায়েখ আলবানীর উগ্রতা ও বাড়াবাড়ির স্বরূপ তুলে ধরেছেন আরব বিশ্বের অসংখ্য লেখক। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ডক্টর মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আল বুয়াইতী লেখেন :

فقد عاش المسلمون قديما وإلى الآن وهم يعلمون بكل بداهة ووضوح أن الناس ينقسمون إلى مجتهدين ومقلدين . و أن على المقلد أن يتبع أحد المجتهدين ...إلى أن ظهرت فئة فى عصرنا هذا فأجات الناس بشرع غريب جديد ...

মুসলমানগণ পূর্বকাল থেকে অদ্যাবধি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সুস্পষ্টভাবে জেনে আসছেন যে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। কিছু হলো মুজতাহিদ আর অন্যরা তাদের মুকাল্লিদ বা অনুসারী। মুকাল্লিদদের ওপর মুজতাহিদগণের অনুসরণ একান্তই অপরিহার্য। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে বর্তমানে আমাদের যুগে একটি দল নতুন করে বিকাশ পেয়েছে। তারা জনগণের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ধরনের নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে। লেখক তাঁর রচিত :

ألا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية

("লা-মাযহাবী মতবাদ মারাত্মক বিপজ্জনক বিদ'আতী দল ইসলামী শরীয়তের জন্য ভয়ংকর হুমকি") নামক বইয়ে লা-মাযহাবীদের উৎপত্তি সূচনা, কারণ তাদের বিপদসঙ্কুল কর্মকাণ্ড এবং শরীয়তের ক্ষেত্রে এদের হুমকির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বইয়ের শিরোনামটিই তাদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিচ্ছে। তবুও ১৪৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি পূর্ণ পড়ে তাদের উৎপত্তির রহস্য ও এদের স্বরূপ সন্ধানে সচেতন হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মুআসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত, পোস্ট বক্স নং ৭৪৬ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত। এ ছাড়া আমার নিকট থেকে আগ্রহীগণ এর ফটোকপি সংগ্রহ করতে পারবেন। এভাবে মদীনা শরীফের প্রখ্যাত আলিম মসজিদে নববীর সুদীর্ঘকালের বরেণ্য উস্তাদ আল্লামা আতিয়্যা মুহাম্মদ সালিম প্রণীত

التراويح أكثر من ألف عام

(এক হাজার বছরে তারাবীর ইতিহাস) নামক বইয়ের অন্তত ভূমিকাটি একবার পড়ার অনুরোধ করেই এ পর্বের ইতি টানছি।

আহলে হাদীস মতবাদ আবিষ্কারের মূল রহস্য

হক ও বাতিলের লীলাক্ষেত্র এ পৃথিবী। যেখানেই হক, সেখানেই বাতিলের অশুভ থাবা। হকের মোকাবেলায় বাতিলের পদচারণ সর্বদাই হয়ে থাকে রহস্যঘেরা। থাকে এর অন্তরালে ধর্মীয় কারণ বা রাজনৈতিক উৎস অথবা জীবিকা নির্বাহের সহজ উপায়। কিংবা সরকারের গোলামি করে নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা ইত্যাদি অজানা রহস্য। আহলে হাদীস বা সালাফী নামের এ নতুন মতবাদটির উৎপত্তির রহস্যও এর ব্যতিক্রম নয়। এ মর্মে আহলে হাদীস মতবাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক নবাব ছিদ্দিক হাসান খানের কয়েকটি স্বরচিত গ্রন্থ তরজুমানে ওহহাবিয়্যায় লেখেন–

"আমাদের নতুন মাযহাবে আযাদী (কারো অনুসরণ না করা) ব্রিটিশ সরকারি আইনের চাহিদা মোতাবেক।" (দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পৃষ্ঠা)

আহলে হাদীস মতবাদের প্রধান মুখপাত্র মিঞা নজীর হুসাইনের অন্যতম শিষ্য, 'উকিলে আহলে হাদীস' হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ মতবাদের তদানীন্তন জেনারেল সেক্রেটারি মৌলভী মুহাম্মদ

হুসাইন বাটালভী লেখেন–
"আহলে হাদীস নামক দলটি ব্রিটিশ সরকারের কল্যাণপ্রত্যাশী, চুক্তি রক্ষাকারী, ও অনুগত হওয়ার অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ প্রমাণ হলো, তারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকা, কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকার চেয়েও উত্তম মনে করে।" (আল হায়াত বাদাল মামাত-৯৩)
তারই বিশিষ্ট শিষ্য মৌলভী আলতাফ হোসাইন লেখেন–
"হিন্দুস্তানে ইংরেজ সরকার আমরা মুসলমানদের জন্য খোদার রহমত" (আহলে হাদীস আওর ইংরেজ-৮৭)

সম্মানিত পাঠক সমাজ
ইংরেজ আমলে ইসলাম ও মুসলমানদের দুরবস্থার করুণ কাহিনী বলার অপেক্ষা রাখে না। যেদিন সাম্রাজ্যবাদী সরকার এ দেশের হাজার হাজার আলেম-উলামা ও মহামনীষীকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল, আর দ্বীপান্তরের কঠিন বন্দিশালায় নিক্ষেপ করেছিল লক্ষ লক্ষ তৌহিদি জনতাকে, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল সেদিন ইজ্জতহারা মা-বোনদের গগণবিদারী আর্তনাদে। জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা হাজার হাজার মসজিদ-মাদরাসা। আর ভস্মীভূত করেছিল লক্ষ-কোটি কোরআন-কিতাব। হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) কর্তৃক দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষিত হয় জিহাদের ফাতওয়া। এ ফাতওয়ার বলে উলামায়ে কেরাম ও সমগ্র তৌহিদি জনতা ঝাঁপিয়ে পড়েন আযাদী আন্দোলনের জিহাদে। শহীদ হন হাজার হাজার বীর মুজাহিদ। আর এমনি এক করুণ মুহূর্তে আহলে হাদীস মতবাদের বিশিষ্টজন সেই ইংরেজ সরকারকে খোদার রহমত বলে আখ্যায়িত করে। তারা কি চায়? কী তাদের উদ্দেশ্য? কোথায় তাদের গন্তব্য? কী রয়েছে আহলে হাদীস নামের অন্তরালে?

বর্তমান বিশ্বে লা-মাযহাবীদের অবস্থান
বর্তমান বিশ্বে যারা আহলে হাদীস, আহলে হক, লা-মাযহাবী অথবা সালাফী ইত্যাদি নামে আত্মবিকাশ করে যাচ্ছে। বস্তুত যেখানে যে নাম সুবিধা, সেটাই ব্যবহার করে থাকে। ১৮০০ ইংরেজি ৯০-এর দশকে তারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার থেকে দরখাস্ত করে আহলে হাদীস নাম বরাদ্দ নেয়। ২০০৫ ইং ১৭ আগস্ট সারা দেশে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের অন্যতম নেতা শায়খ আব্দুর রহমান নতুন দলের নাম জেএমবি বলে প্রকাশ করেন। তিনি আহলে হাদীস মতবাদের অন্যতম আমীর মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফজলের বড় ছেলে। তিনি ২০০৫ ইং সালে সারা দেশে ৬৩টি জেলায় সাড়ে পাঁচ শত বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। তাঁর আরেক শিষ্য বাংলা ভাই। বোমাবাজি ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের জন্য তাঁদের ফাঁসি হয়েছে।
(দৈনিক প্রথম আলো, ৫ আগস্ট ২০১৭ ইং, দৈনিক যায়যায়দিন ৭ আগস্ট ২০০৬ ইং)
বর্তমানে অনেক তৎপর জনৈক আলেম, নাম মুজাফফর বিন মুহসিন। নামাযের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বই-পুস্তক রচনা করেছেন। বিগত ১৭ ডিসেম্বর ১৭ ইং থেকে ফেসবুকে দেখলাম, তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) ভুল করেছেন, সাহাবাগণ ভুল করেছেন, আমি ভুল করি", (নাউযুবিল্লাহ)
তাঁর বক্তব্যটা আমি নিজেই ভিডিও মাধ্যমে দেখেছি, শুনেছি। তা সংরক্ষিত আছে।
পাঠক ভাইগণ চিন্তা করুন! আহলে হাদীস ভাইদের এই কাজ। কেউ আহলে হাদীস মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বোমা মারে আর কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণ সম্পর্কে জঘন্য কটূক্তি করে যাচ্ছেন। নিজেকে রাসূল (সা.) ও সাহাবাদের সাথে তুলনা করেছে।
চলমান বিশ্বে আরেক ব্যক্তি আশাতীত পরিচিতি লাভ করেছেন। ডাক্তারি ডিগ্রি ছাড়া সফল চিকিৎসক! আইন পাস না করে উকিল-জজ! স্কুল-ইউনিভার্সিটিতে না গিয়ে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার! স্মরণকালের ইতিহাসে এসব কেউ শোনেনি। গায়েবীভাবেও কেউ এমন জাদু পায়নি। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও স্মার্ট ইসলামী স্কলার, উস্তাদ ছাড়া কোরআন-হাদীসের সেরা গবেষক প্রতি যুগেই উদয় হয়। টিভি, ইন্টারনেটে আহলে হাদীস মতবাদের অলৌকিক ভার্সন ডা. জাকির নায়েক তাদেরই একজন। তিনি যাঁর অনুসরণ করেন, শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী তিনিও কোথাও না পড়ে নিজে নিজেই ইসলামী স্কলার হয়েছেন। আদালত চলে না আইনবিদ ছাড়া, হাসপাতাল চলে না ডাক্তার ছাড়া, ভার্সিটি চলে না অনুমোদিত প্রফেসর ছাড়া, ইসলামী গবেষণা চলবে কেন নিয়মনীতি ছাড়াই! আবদারটা মামার বাড়ির কলা! মন্দ নয়! এ ধরনের গবেষক আর গবেষণা ও অনুসারীদের গতিতে কে ব্রেক দেবে? ভাবনার বিষয়।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীস মতবাদের আক্রমণের স্বরূপ
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "তোমরা আহলে কিতাবের সঙ্গে মতবিরোধে উত্তম পন্থা পরিহার করো না।" [আনকাবুত-৪৬]
হযরত মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন,
"ফেরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।" [ত্বোয়া, হা-৪৪]
বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.)

কোনো ক্ষেত্রেই অশ্লীলতাকে পছন্দ করতেন না। [আহমদ-২/ ১৯, হা. নং ৪১৭৭]

বলা বাহুল্য, এ ধরনের আরো অগনিত আয়াত ও হাদীসের দাবি হলো, দ্বীন ধর্মের কাজে তর্ক-বিতর্ক অথবা মতবিরোধের প্রয়োজন হলে তা করতে হবে উত্তম পন্থায়, শালীনতার আলোকে। মতবিরোধ ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই চলে আসছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তা হবে কোরআন-সুন্নাহর সীমারেখা অনুসারে। ক্রোধ, ক্ষোভ, হিংসা, নিন্দা, অশ্লীলতা ইত্যাদি হারাম কাজ পরিহার করে সুন্দর ও শুভেচ্ছামূলক উপস্থাপনা, উত্তম পন্থা ও শালীনতার সাথে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সাম্প্রতিককালে কিছু এমন মতাদর্শী লোকের আবির্ভাব ঘটেছে হিংসা, নিন্দা, অকথ্য গালমন্দ, কুৎসা রটানো আর অপবাদ দেওয়াই এদের নিকট প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অন্যতম হাতিয়ার। বিশেষ করে "আহলে হাদীস" নামক এ সম্মানজনক উপাধির দাবিদাররা আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মাযহাব অবলম্বী সাধারণ মুসলমান, বিশেষত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও পাক ভারতের প্রথিতযশা উলামায়ে কেরামকে তাদের বিদ্বেষী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। সলফে সালেহীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা এদের মজ্জাগত অভ্যাসে রূপ নিয়েছে। ইমাম আবু হানিফার নাম শুনলে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। বাস্তব পরিস্থিতি দেখে বোঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা আর হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণই তাদের আসল মিশন।

আহলে হাদীস মৌলভী আবু শাকুর তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ সিয়াহাতুল জানানের চতুর্থ পৃষ্ঠায় লেখেন, "হক্ব মাযহাব শুধু আহলে হাদীস ছাড়া সবাই মিথ্যুক ও জাহান্নামী।"

রংপুর শোলবাড়ী নিবাসী মৌলভী আব্দুল কাদের তাঁর স্বীয় রচিত গ্রন্থ, তাম্বীহুল গাফেলীনের সাত পৃষ্ঠায় লেখেন,
"মাযহাবীগণ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। তাদের মধ্যে ইসলামের কোনো অংশ নেই।"

মাওলানা আব্দুর রহমান মাযহাবীদের যুক্তির সন্ধানে বইয়ের ভূমিকায় লেখেন, "হানাফী মাযহাব ৭২টি জাহান্নামী দলের একটি।"

এ ধরনের অগনিত ন্যক্কারজনক ও অকথ্য, অশ্লীল ভাষায় তাদের বই-পুস্তক ও ফেসবুক-ইন্টারনেট পরিপূর্ণ। কথিত আছে, যে কাপড় খুলে রাস্তার পাশে মলত্যাগ করে তার তো কোনো লজ্জানুভূতি নেই। কিন্তু যে দেখছে সে লজ্জায় কাতর। ঠিক অনুরূপভাবে যারা এ সমস্ত মাতলামী প্রলাপ ব্যক্ত করেছে, তাদের কোনো লজ্জানুভূতি না হলেও মূলত এগুলোর আলোচনা, পর্যালোচনা করতে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে। আমি অবাক, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব মানুষ হয়ে তারা এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপে কিভাবে লিপ্ত হয়?

শিয়া সম্প্রদায় ও লা-মাযহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস মতবাদের গুটিকয়েক ব্যতীত মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ, সমস্ত মুফাসসির, মুহাদ্দিস, হাদীস সংকলক, ব্যাখ্যাকারক প্রায় সবাই তো কোনো না কোনো মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আহলে হাদীসের শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা ছিদ্দিক হাসান খান স্বীয় গ্রন্থ "আবজাদুল উলূমের" ৮১০ পৃষ্ঠায় এবং শাহওয়ালী উল্লাহ 'আল ইনসাফ' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় ইমাম বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। এভাবে হাদীসের সব ব্যাখ্যাকারক যেমন, উমদাতুলকারী প্রণেতা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী, ফাতহুল বারী প্রণেতা ইবনে হাজার আসক্বালানী শাফেয়ী, ফয়জুল বারী প্রণেতা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি হানাফী প্রমুখ সকলেই তো এ পথের পথিক। তাঁরা সবাই যদি কাফের-মুশরিকই হয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের সংকলিত হাদীস ও মতামত তারা গ্রহণ করে কোন হাদীসের ভিত্তিতে? দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে বিদ'আতী, কাফের, মুশরিক ও জাহান্নামী আখ্যায়িত করত শুধু তারা গুটিকয়েক বেহেশতে বসবাস করতে চায়। আল্লাহর বেহেশত কি তাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের মতো এতই ছোট? বিদ'আতী, কাফের, মুশরিক আখ্যায়িত করেছে তারা দুনিয়ার সবাইকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা এযাবৎ মুসলমান ও বেহেশতী বানিয়েছে কয়জনকে? তারা কি মানুষকে কাফের-মুশরিক বানানোর দায়িত্ব পেয়েছে?

তাদের এ অবস্থার প্রতি বিব্রত বোধ করেই মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) কতই না সুন্দর কথা বলেছেন, মাযহাব অমান্যকারীরা যদি এমন বিশ্বাস অন্তরে নিয়ে বসে থাকে, তাহলে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী মুসলমানদের সামান্য কয়েকজন বাদ দিয়ে সবাই পথভ্রষ্ট হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। তাই এমন ধারণা তো ওই মূর্খ বা আহমকই শুধু করতে পারে, যে স্বয়ং তার মূর্খতার খবর রাখে না। অথবা সেই যিন্দীক বা নাস্তিকের জন্যই এমন ধারণা পোষণ শোভা পায়, যার উদ্দেশ্য হচেছ মুসলমানদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে নিরাশা সৃষ্টিকরত খোদ ইসলামকেই আংশিক বা পুরোপুরি অচল করে

দেওয়া। তারা গুটিকয়েক হাদীস মুখস্থ করে শরীয়তের সমস্ত বিধি-বিধান শুধু এই কয়েকটি হাদীসের মধ্যেই সীমিত হওয়ার বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বসে আছে। নিজের অজানা সব কিছুকে তারা অস্বীকার করে চলেছে। (মাকতাবাতুল ইমাম রাব্বানী, ২/১০৭-১০৮ মাকতুব নং-৫৫)

এ পরিসরে ছোট একটি ঘটনা লিখেই সমাপ্তির দিকে যাব। ১৯৯৯ ইং সালের কথা, আমি তখন মদীনা ইউনিভার্সিটির হাদীস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শ্রেণীকক্ষে। আমাদের উস্তাদ শায়খ আব্দুর রহমান বিন মুহিউদ্দীন নাইলুল আওতারের দরস দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি তাবলীগ জামা'আতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনীহামূলক আলোচনায় মেতে ওঠেন। সাথে সাথে আফ্রিকার জনৈক ছাত্র হাত উঁচু করে বলে, শায়খ! তাবলীগ জামা'আত হলো সংস্কারমূলক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছার এক অভিনব পথ, যার বদৌলতে লাখ লাখ মুসলমান সত্যিকার ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এবং এদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর আনাচকানাচ।

শায়খ বলেন, সামনে তাবলীগ জামা'আতের উদাহরণ হবে এমন যে, কোনো ব্যক্তি মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, এমতাবস্থায় তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা তাকে উদ্ধারকরত প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু তারা তাকে তীরে বিবস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে।

উত্তরে ছাত্রটি বলে, তারা তো লোকটিকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনারা গিয়ে অন্তত বস্ত্র পরিধানের কাজটা করেন। শায়খ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "বেটা, তুমি খুবই চমৎকার বলেছো। বস্তুত মাযহাব, উলামায়ে দেওবন্দ, তাবলীগ জামা'আত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে যারা কটূক্তি করে চলেছে তারাও অবুঝ ও অজ্ঞতাবশতই এমন করছে। ওই শায়খের মতো সঠিক বুঝশক্তি ও হেদায়াতের অনুসন্ধান থাকলে আল্লাহ পাক তাদেরকেও সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। অতএব, আমরা তাদের সাথে প্রতিহিংসা না করে তাদেরকে

বোঝানোর চেষ্টা করি এবং তাদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করি। এ মর্মে আল্লাহ পাকের ইরশাদ আমাদের জন্য অবিস্মরণীয় পাথেয় হোক–

"রাহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন অজ্ঞরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে, "সালাম"। [আল ফুরকান-৬৩]

(২২ পৃষ্ঠার পর)

মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথার জায়গা একটাই–বাংলাদেশের মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে! তাদের দৃষ্টিতে এটাই বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। তাই ওই পত্রিকা খুললেই দেখা যায় 'বিয়ে ভাঙতে পারা সাহসী নারী'র খবর। অন্যদিকে প্রতিনিয়ত প্রেম ও পরকীয়ার কলাকৌশল শেখাচ্ছে তারা। একটি লেখার শিরোনাম, 'ছেলে-মেয়ের কি শুধুই বন্ধুত্ব হয়?' (https://goo.gl/Qe85Qe)। আরেকটি লেখার শিরোনাম, 'অফিসে কি বন্ধুত্ব হয়?' (https://goo.gl/55viQa)

ওই পত্রিকার ফিচার 'অধুনা'য় বাংলাদেশের হাজার বছরের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুরুষদের রান্নাবান্না করার পদ্ধতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। কেননা নারীকে তারা ঘর থেকে বের করে তার ওপর ডাবল দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। একদিকে অফিস সামলানো। অন্যদিকে ঘর সামলানো। সেই মাইনকার চিপা থেকে রক্ষার তাগিদে নারীবাদী ও তাদের অর্থপুষ্টরা এখন পুরুষদের দিয়ে রান্নাবান্নার কাজ সামাল দেওয়ার পাঁয়তারা করছে।

একটি লেখার শিরোনাম, 'সুখী পুরুষের রান্নার ক্লাস!' (https://goo.gl/ hcCMGA)

তারা কিভাবে আমাদের সমাজ ধ্বংস করছে দেখুন : তাদের পছন্দের গবেষণা বলছে, মা আর শাশুড়ির সঙ্গে থাকলে নাকি সন্তান কম হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জরিপ দেখিয়ে তারা এ বিষয়ে একটি নিউজ করেছে। শিরোনাম হলো, 'মা-শাশুড়ির সঙ্গে থাকলে সন্তান কমে!'

(https://goo.gl/kP1yCT)

গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ ওই পত্রিকার 'জীবনযাপন' বিভাগে একটি লেখা ছেপেছে। লেখাটির শিরোনাম হলো, 'বিয়ের স্থায়িত্ব কতটা?' এটি লিখেছেন ফজলুল কবির নামক একজন ব্যক্তি। সেখানে তিনি লিখেছেন,

'এখন আর গুটিকয় দেশ ছাড়া মানুষ মাত্রই বিয়ে অনিবার্য নয়। এমনকি সন্তানাদির মা-বাবা হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তিটি না হলেও চলে অনেক দেশে। বিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট-এর তথ্য বলছে, ২০১৫ সালে আমেরিকায় জন্ম নেওয়া শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশের মা-ই ছিলেন অবিবাহিত। ফ্রান্সে এ হার ৫৯ শতাংশ। আর কলম্বিয়ায় ৮৪ শতাংশ।

'(https://goo.gl/yvYQss)

আমার প্রশ্ন হলো, এসব মিডিয়া কি বাংলাদেশের সমাজকে ইউরোপের আদলে গড়ে তুলতে চায়?

ওই পত্রিকা ও কথিত গবেষকদের সে অধিকার কে দিয়েছে?

শিশুশিক্ষা : অভিভাবকের করণীয়

মুফতী শরীফুল আজম

সন্তানের তরবিয়ত

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে তাদের যথাযথ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা অভিভাবকের অন্যতম একটি গুরুদায়িত্ব। বলতে গেলে এটি একজন সফল মানুষের জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ। মূলত মা-বাবার ওপরই এ মহান দায়িত্ব বর্তায়। সন্তানকে মানুষ করার মুখ্য ভূমিকা তাঁদেরই। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

পুরুষ তার পরিবারের পরিচালক এবং তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। আর নারী তার স্বামীর সংসার দেখভালের দায়িত্বশীল এবং এ ব্যাপারে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। (বোখারী শরীফ ৮৯৩, মুসলিম শরীফ ৪৭২৪)

অপর হাদীসে এসেছে :

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

সন্তানদেরকে তোমরা আদব শেখাও এবং উত্তম দীক্ষা দান করো। (ইবনে মাজাহ)

এক হাদীসে আছে :

عن على بن أبى طالب قال :قال رسول اللـه صلـى اللـه عليه وسلم :أدبوا أولادكم على ثلاث خصال :حب نبيكم، وحب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإن حملة القرآن فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، مع أنبيائه وأصفيائه

সন্তানদেরকে তোমরা তিনটি বিষয় শিক্ষা দান করো। এক. নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, দুই. আহলে বাইত তথা নবীজি (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালোবাসা, তিন. পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত। কেননা কোরআনের ধারক-বাহকগণ কিয়ামতের কঠিন দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন। যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়াময় স্থান থাকবে না। (কানযুল উম্মাল, জামেউস সগীর)

পিতার দায়িত্ব

এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিজ সন্তানের ব্যাপারে নালিশ করল, ছেলে কথা শোনে না। হযরত উমর (রা.) ছেলেটিকে ডেকে সাবধান করলেন এবং মা-বাবার হক আদায় না করায় তাকে শাসন করলেন। ছেলেটি বিনয়ের সাথে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! বাবার ওপর ছেলের কোনো হক নেই কি? তিনি বললেন, কেন থাকবে না? সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! ওই হক তাহলে কী? তিনি বললেন, বিয়ে করার সময় সন্তানদের জন্য ভালো মা নির্বাচন করা, বাচ্চার সুন্দর নাম রাখা এবং তাকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেওয়া। (ইসলাম এবং তরবিয়তে আওলাদ, পৃ. ১৪২)

অতএব সন্তানকে মানুষ করতে হলে একজন বাবার প্রতিটি পদক্ষেপে থাকতে হবে বিচক্ষণতা এবং দায়বদ্ধতার ছাপ। নেক সন্তানই হতে পারে পরকালের সম্বল। এই বিশ্বাস নিয়ে সন্তানকে ঘিরে বুনতে হবে স্বপ্নের জাল। সন্তানের জন্য হালাল উপার্জনে মনোযোগী হতে হবে। নিজেকে বেকার বা অকর্মণ্য না ভেবে ছোট-বড় যেকোনো হালাল রোজগারে লেগে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাবার অলসতা বা মানবিক দুর্বলতা সন্তানের জীবন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

মায়ের দায়িত্ব

সন্তান পৃথিবীতে এসে সর্বপ্রথম যার সান্নিধ্য লাভ করে তিনি হচ্ছেন মা। সবচেয়ে বেশি যাঁর অনুসরণ বা অনুকরণ করে তিনি হচ্ছেন মা। মায়ের প্রতিটি কথা ও কাজ, আচার-আচরণ শিশুর অবচেতন মনে রেখাপাত করে। তাই মায়ের কোল শিশুর প্রথম পাঠশালা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সাবালক হওয়া পর্যন্ত মায়ের আঁচলে জড়িয়ে থেকে রপ্ত করে ফেলে মায়ের শিক্ষা। তাই আদর্শবান মায়ের পক্ষেই কেবল সম্ভব আদর্শ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা। অতএব প্রথমে মাকে তৈরি হতে হবে। মা বনলে শিশু বনবে, মা বিগড়ালে শিশু বিগড়াবে।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে বাবার চেয়ে মায়ের দায়িত্ব বেশি। এর জন্য সময় দিতে হবে প্রচুর। বাইরে কর্মব্যস্ত সময় না কাটিয়ে সন্তানের দেখভালে সময়, সক্ষম ও মেধা কাজে লাগাতে

হবে। সন্তানকে মানুষ করতে হলে এর বিকল্প কিছু নেই। এটাকেই বলে পরিবার। মা-বাবা উভয়ে ঘরের বাইরে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লে আয়া-বুয়া আর কেয়ারটেকার দিয়ে সন্তান মানুষ করা সম্ভব হবে না। বাবার দরদমাখা শাসন আর মায়ের মমতা না পেলে সন্তান হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ঈমানী দীক্ষা

সদ্যঃভূমিষ্ঠ শিশুর ডান কানে আযান আর বাঁ কানে ইকামত দেওয়ার মাধ্যমে সূচিত হয় ঈমানী দীক্ষা। তাই শিশু যখন বড় হতে থাকবে তাকে ধীরে ধীরে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে বোঝাতে হবে। যখন সে আরেকটু বড় হবে তখন নামায-রোজার মতো

ইসলামের বুনিয়াদি আমলসমূহে অভ্যস্ত করতে হবে। আরো বড় হলে ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " :افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَآخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا سُئِلَ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ

নবীজি (সা.) বলেন, তোমাদের শিশুদের সর্বপ্রথম কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিখাও। আর যখন মৃত্যুর মুখে উপনীত হয় তখনও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তালকীন করো। কেননা যার প্রথম কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর শেষ কথাও হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে একটি গোনাহ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে না।(শু'আবুল ঈমান ৬/৩৯৮ হা. ৮৬৪৯)

তাওহীদের এই কালেমার শিক্ষা হচ্ছে, অদৃশ্য জগতের ওই সকল বিষয়ে ঈমান আনা, যা কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস, ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাবাদী এবং সকল নবী-রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। কবরের জীবন, ফেরেশতাদের সাওয়াল-জবাব, কবরের আজাব বা আরাম, পুনরুত্থান, হাশর-নাশর, হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি। ঈমানের এসব বিষয়ে সন্তানকে সময়ে সময়ে শিক্ষা দিতে হবে।

আমলের দীক্ষা

সন্তান বুঝমান হওয়ার সাথে সাথে তাকে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে ধারণা দিতে থাকতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, তাঁর অবাধ্য হইও না। সন্তানদেরকে তাঁর আদেশ মানা এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দাও। কেননা এটা তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। (ইসলাম আওর তরবিয়তে আওলাদ ১৬৩)

বস্তুত ছোটকাল থেকেই সন্তানকে ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে ধারণা দেওয়া আরম্ভ করা হলে তার মাঝে এর গুরুত্ব পয়দা হবে। ফলে বড় হলে সহজেই সে এর ওপর আমল করতে পারবে। যেমন বাচ্চাকে শিখাতে হবে, মিথ্যা বলো না, মিথ্যা বললে সবাই তোমাকে পচা বলবে। অথবা গান-বাজনা শুনতে নেই, এতে গোনাহ হবে। টিভি দেখো না, টিভি দেখলে আল্লাহ আগুনে ফেলে দেবেন ইত্যাদি সহজ ও ছোট ছোট বাক্যে শিশুকে বোঝাতে হবে।

সাত বছরে উপনীত হলে সন্তানকে নামায-রোজার কথা বলতে হবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

নবীজি (সা.) বলেন, 'সাত বছর পূর্ণ হলে তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ দাও। ১০ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রহার করো এবং তাদের জন্য পৃথক পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করো।'

(আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯৫)

অতএব সাত বছর বা এর পূর্বেই নামাযের প্রয়োজনীয় দু'আ এবং সূরা-কেরাত সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে, তবেই তো সে নামায আদায়ের বয়স হলে সঠিকভাবে তা আদায় করতে পারবে। বালেগ হওয়ার আগেই তাকে নামাযের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারলে বালেগ হওয়ার পর একজন নামাযী হিসেবে জীবন যাপন করতে পারবে। অনুরূপ রোজার বিষয়টিও এমনই। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তাকে রোজার অভ্যাস করাতে পারলে রোজা ফরয হওয়ার পর তা পালন সহজ হবে।

সাধ্য থাকলে সন্তানকে নিয়ে হজ-উমরা করা উচিত। এতে সে ছোটকাল থেকেই ইসলামের হুকুম জানতে পারবে ও শিখতে পারবে।

সন্তানের শিক্ষা

শিক্ষকের হক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বয়স হলে সন্তানকে শিক্ষকের হক সম্পর্কে ধারণা

দেওয়া অতি জরুরি। যেমন : ১. শিক্ষকের আদব রক্ষা করা। ২. শিক্ষকের প্রতি ভক্তি রাখা। ৩. শিক্ষককে আজমত ও শ্রদ্ধা করা। ৪. শিক্ষকের যথাসাধ্য খেদমত করা। ৫. শিক্ষকের সামনে বিনয়ের সাথে কথা বলা ইত্যাদি।

অতিউৎসাহ কাম্য নয়

পারিবারিক তরবিয়তের পর আসে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পালা। সন্তান অনেক বড় কিছু হোক–এ আশা যেকোনো পিতা-মাতারই থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এর জন্য তাড়াহুড়ার অবকাশ নেই। ধৈর্য ধরতে হবে। আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সঠিক বয়সের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে, শৈশবের খেলাধুলা, আদর-সোহাগ বিসর্জন দিয়ে শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত করা তার দৈহিক ও মানসিক গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর। অবুঝ শিশুকে মাতৃকোল থেকে দূরে সরিয়ে পাঠচর্চায় ঠেলে দেওয়া শিক্ষার প্রতি বিরক্তির অন্যতম কারণ। দুরন্তপনা, দুষ্টুমি, চাঞ্চল্য আর বায়না ধরার বয়সে পড়ালেখার চাপ তার পক্ষে অস্বস্তিকর। বড়দের মতো রুটিনের শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলতে সে নিরানন্দ বোধ করে। ফলে তার মন চায় সদা এই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পালাতে, যেকোনো ঠুনকো বাহানায় প্রতিষ্ঠানে না যেতে। ক্লাসে তার মন বসে না। অপেক্ষায় থাকে ছুটির ঘণ্টা কখন বাজবে আর অমনি ছুটে যাবে খেলার সাথিদের কাছে। উপভোগ করবে শৈশবের সব আনন্দ।

কিন্তু মুক্ত হওয়ার এ সাধ সে মেটাতে পারে না। অতিউৎসাহী অভিভাবকের চাপ এতে বাদ সাধে। শিশুর ওপর ক্লাস, কোচিং এবং হোম ওয়ার্কের চাপ বাড়ে। তাড়া দেওয়া হয় শিক্ষকদেরকেও। শিক্ষক-অভিভাবকের যৌথ চাপে বেচারা কচি শিশু নাজেহাল। ফলে শৈশবে তার মনে বপন হয়ে চলে পড়ালেখার প্রতি বিস্বাদ। কে এর জন্য দায়ী? দায়ী ওই অতিউৎসাহ ও প্রত্যাশার বাড়াবাড়ি।

অসুস্থ প্রতিযোগিতা

আমি যদি জিতে যাই জিতে যান মা, আমি যদি হেরে যাই হেরে যান মা। শিশুদের নিয়ে এক শ্রেণীর মায়েরা নিজেদের হার-জিতের খেলায় মেতে আছেন। এর জন্য শিশুকে বাড়তি চাপ দিয়ে পড়াশোনা করাচ্ছেন। ভর্তি পরীক্ষার নাম হয়ে গেছে ভর্তিযুদ্ধ। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা যেন মিনি বিসিএস। শিশুর ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি চাপ প্রয়োগের ফলে তার ব্রেনে প্রভাব পড়ে, ফলে সে হয়ে ওঠে বিকারগ্রস্ত। শিশুর জীবনকে এমন ঝুঁকিতে ফেলা একজন সচেতন অভিভাবকের জন্য কখনো সমীচীন নয়।

আমি পারি না

বয়স অনুযায়ী শিশুর সক্ষমতা এবং ধারণক্ষমতা বিবেচনা না করে অনেক অভিভাবক কেবল নিজের অভিলাষ আর স্বপ্ন পূরণে শিশুকে অসময়ে অনেক বেশি শিখিয়ে ফেলতে চায়। বাড়তি এ ভার আরোপের ফলে শিশুকে হতাশায় পেয়ে বসে। ফলে তার মাঝে জন্ম নেয় না পারার বোধ। সে ভাবে, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। কথায় কথায় বলে, আমি পারি না, পারব না। অথচ অগ্রগামিতার জন্য আত্মবিশ্বাস অতি জরুরি। আর না পারার বোধ শিশুকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। এর জন্য দায়ী সক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ।

উৎসাহ প্রদান

প্রতিটি শিশুর মাঝে নিজস্ব প্রতিভা সুপ্ত থাকে। কারো বিকাশ জলদি ঘটে, কারো ঘটে ধীরে। তাই তুলনামূলক বেশি মেধাবীর সাথে শিশুদের কখনো তুলনা করতে নেই। অমুকে পারে তুমি কেন পারো না বলে তিরস্কার না করে বরং উৎসাহ প্রদান করা চাই। মাশাআল্লাহ সুন্দর হয়েছে, তুমি দেখি সব পারো, তোমাকে আরো ভালো করতে হবে। এ ধরনের কথা বলে শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস জন্মানো উচিত। এভাবে রয়েসয়ে শিশুর সক্ষমতা বুঝে চালানো হলে তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। শানিত হবে তার মেধা। সাহস সঞ্চার হবে তার মনে।

সঠিক বয়স

জেনে রাখা দরকার, শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঠিক বয়স কত বছর। এ ব্যাপারে একটি হাদীসের আলোকে বলা যায়, সাত বছর বয়স থেকে তা হতে পারে।

নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের হুকুম দাও। (আবু দাউদ হাদীস নং-৪৯৫)

এতে বোঝা গেল, নামায যদিও বালেগ হওয়ার পর ফরয হবে; কিন্তু নামাযের শিক্ষাদান করতে হবে সাত বছর বয়স থেকেই। কাজেই সাত বছর বয়সই যথারীতি শিক্ষাদানের উপযুক্ত সময়। এরপর বিলম্ব করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এর আগে চাপাচাপি করাও উচিত নয়।

কিন্ডারগার্টেন

কিন্ডারগার্টেনের শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ করলে আমাদের করণীয় নির্ণয় সহজ হতে পারে। বাংলা একাডেমির অভিধান মতে Kin-der-gar-ten অর্থ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের বয়স হয়নি, এমন শিশুদের জন্য স্কুল; জার্মান পণ্ডিত ফ্রোয়েবলের নীতি অনুসারে খেলার মাধ্যমে শিশুমনের বিকাশ সাধনের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়। অতএব কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের খেলার ছলে যতটুকু পড়ানো যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পবিত্র কোরআন শিক্ষা

তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তা সহজ করে দিয়েছেন। শিশুর বয়স যত কমই হোক না কেন, কোরআনের শিক্ষা তার ব্রেনে কোনোরূপ চাপ সৃষ্টি করে না। মুখে বোল ফোটার সাথে সাথেও যদি শিশুকে আল্লাহ আল্লাহ বা কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ শেখানো হয় তবুও সে তা সহজেই রপ্ত করতে পারে। এমন অভিজ্ঞতা কমবেশি সব মা-বাবারই রয়েছে।

অতএব যে বয়সে শিশু পার্থিব পাঠ গ্রহণে অপরিপক্ব বা অনুপযুক্ত থাকে সে সময়ে তাকে কোরআন শিক্ষা দিয়ে দেওয়াই হবে সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন।

ব্যাগের বোঝা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই শিক্ষা নিতে গিয়েই আজ বইয়ের বোঝায় শিশুদের মেরুদণ্ড বিকল হয়ে যাচ্ছে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিক্ষার নামে কোমলমতি শিশুদের অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা যেমন অমানবিক, তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ভারী ব্যাগ বহনের ফলে শিশুদের মেরুদণ্ডের হাড় বাঁকা হয়ে যায়। এতে তার স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। তাই শিশুদের বইয়ের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়ে আনন্দপূর্ণ শিক্ষাজীবন দিতে হবে। এ জন্য সর্বপ্রথম অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। অভিভাবকরা যেন তাদের সন্তানদেরকে গ্রন্থকীট হিসেবে গড়ে না তোলেন বরং শিশুর মনোদৈহিক চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে আস্তে ধীরে অগ্রসর হোন।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এক রায়ে বলেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী ব্যাগ বহন করা যাবে না। (কালের কণ্ঠ ৮/১২/১৬ ইং)।

হাইকোর্টের এই রায় অবশ্যই শিশুবান্ধব ও সময়োপযোগী হয়েছে। এই রায়কে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এটা বাস্তবায়ন হলে শিশুদের পড়ালেখা হবে আনন্দদায়ক।

সুস্থ মা, সুস্থ শিশু

বাচ্চাদের স্কুল-কোচিংয়ে হাজিরা দিতে গিয়ে নিত্য পেরেশানিতে মায়েরা। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এবং তাদের ভালো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে বর্তমান সময়ে অভিভাবকদের বলা যায় এক প্রকার যুদ্ধে নেমেছেন। বিশেষ করে এ ব্যাপারে গৃহিণী ও কর্মজীবী মায়েদের আন্তরিকতার শেষ নেই। ঘরের কাজের বাইরে একজন মা স্কুল, কোচিংসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণমুখী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দিনের প্রায় পুরো সময়টাই তাঁর সন্তানের পেছনে ব্যয় করছেন। সংসার সামলানোর পাশাপাশি সন্তানের পড়ালেখার তদারকি করার দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। সব মিলিয়ে একজন মায়ের কর্মব্যস্ত দিন শুরু হয় সেই ভোর থেকে, যা চলে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত। আর সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়তে গিয়ে এই মায়েরা তাঁদের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি অবিচার করছেন। নিজের যত্নের প্রতি তাঁরা অমনোযোগী হয়ে পড়ছেন। অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান না করা ও যথাযথ বিশ্রাম গ্রহণ না করায় তাঁরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এর ফলে এই মায়েরা উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপ, আলসার, ডায়াবেটিস, রক্ত ও পানিশূন্যতা, পেটের পীড়া, গ্যাস্ট্রিক, মাথা ঘোরা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

এই যদি হয় মায়ের অবস্থা, তাহলে শিশু সুস্থ থাকবে কী করে? মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখা তাই অতিব জরুরি, কেননা সুস্থ মা-ই উপহার দিতে পারেন সুস্থ শিশু। সন্তানের পড়ালেখায় অতিউৎসাহ দেখাতে গিয়ে নিজেকে ভুলে গেলে চলবে না।

সারকথা

সন্তানের শিক্ষাদানে অতিউৎসাহ বা তাড়াহুড়ার অবকাশ নেই। ধীরস্থিরভাবে এগোতে হবে।

سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

নবীজি (সা.) বলেন, ধীরস্থিরতা আল্লাহর রহমতস্বরূপ আর তাড়াহুড়া শয়তানের কাজ। (তিরমিযী-হাদীস-২০১২)

উল্লেখ্য, ধীরস্থির মানে সময়ক্ষেপণ নয় বরং সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। সাথে সাথে শিশুর সক্ষমতার মাত্রার প্রতি দৃষ্টি রাখা। উপযুক্ত সময়ে সে যতটুকু পড়াশোনা করার কথা, তা হচ্ছে কি না এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

সর্বোপরি শিশুকে আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখা আবশ্যক। মহান আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূলের (সা.) আদর্শে গৃহকে সজ্জিত করা হলে সেই আদর্শের আলোকে শিশুরা আলোকিত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে। ইনশাআল্লাহ্।

ভিন্ন চোখে কওমি মাদ্রাসা-১৫

মাওলানা কাসেম শরীফ

ইসলামী শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ :
সভ্যতার প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। যে জাতি যতটা শিক্ষিত, সে জাতি ততটা উন্নত। কোনো জাতি ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার আলোয় মানুষ অন্ধকারকে জয় করে। অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পায়। মুক্তির পথের দিশা খুঁজে পায়। আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, হেদায়েত-গোমরাহি, নীতিনৈতিকতা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পরখ করার অন্যতম মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানবপ্রাণের লুক্কায়িত পশুত্বকে অবদমিত করে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। মানুষকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী করে তোলে।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামই সর্বপ্রথম মূর্খতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বরং সব অধিকার ও কর্তব্য চাপিয়ে ইসলাম শিক্ষাকে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য ও অধিকারবলে ঘোষণা করেছে। বিশ্বমানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ইসলাম ধর্মের প্রথম আহ্বান এমন :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থ : 'পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।' (সূরা : আলাক, আয়াত : ১-৫)

মানুষের ওপর আল্লাহর যত নিয়ামত ও অনুগ্রহ রয়েছে, শিক্ষার নিয়ামতকে পবিত্র কোরআনে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ

অর্থ : 'দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।' (সূরা আর-রাহমান, আয়াত : ১-৩)

এখানে মানব সৃষ্টির বিষয়টির ওপরে শিক্ষাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পুরো সৃষ্টিজগৎ, এমনকি ফেরেশতাদেরও পেছনে ফেলে মানুষ যে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হয়েছে, তার মূলেও রয়েছে শিক্ষা। সে বার্তা দেওয়ার জন্যই মানব সৃষ্টির প্রসঙ্গের আগে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

ফেরেশতাদের ওপর আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এরই মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অর্থ : 'আর আল্লাহ শিখালেন আদমকে সব বস্তুর নাম। তারপর সেসব বস্তু ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করেন। অতঃপর বলেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা (শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে) সত্য হয়ে থাকো। তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোনো কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদের শিখিয়েছ, (সেগুলো ছাড়া)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা, আয়াত : ৩১-৩২)

পড়া আর লেখার সমন্বয়ই শিক্ষা। আর লিখতে হলে দরকার কলমের। তাই কলমের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য পবিত্র কোরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আল কলম' নামে। ইরশাদ হয়েছে :

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

অর্থ : 'নূন, শপথ কলমের ও সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে।' (সূরা কলাম, আয়াত : ১)

লিখিত ও গ্রন্থিত বস্তুকেই বলা হয় বই বা গ্রন্থ। আর আল্লাহ কোরআনের নাম রেখেছেন 'আল কিতাব' করে। যার অর্থ গ্রন্থ বা বই। ইরশাদ হয়েছে :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

'এটা সেই কিতাব (বা গন্থ), যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি পথনির্দেশ।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২)

শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের। তাই আল্লাহ মানুষকে শেখানোর জন্য শিক্ষকও পাঠিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থ : 'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার

আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।' (সূরা জুমুআ, আয়াত : ২)

একজনের শিক্ষা অন্যজনের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে ভাব বিনিময় শিখিয়ে দিয়েছেন, ইরশাদ হয়েছে :

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

অর্থ : 'তিনিই (আল্লাহ) তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।' (সূরা : আর-রহমান, আয়াত : ৪)

শিক্ষার সব উপকরণ পাঠানো হলো, কিন্তু সেই শিক্ষা ধারণ করার মতো কি মানুষের আছে?

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়েও সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতার জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর এ যোগ্যতা নেই। শিক্ষার মাধ্যমে অজানাকে জানার এবং জানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে অজানার সন্ধান করার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ : 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের (শিক্ষার অন্যতম উপকরণ) কান, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো।' (সূরা নাহল, আয়াত : ৭৮)

শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতিসত্তা। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো শিক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, জীবনের সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি করা কেবল উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণও শিক্ষা।

মহানবী (সা.) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন তাঁর মহান শিক্ষার মাধ্যমে।

দাওয়াত ও তা'লীমের সখ্য

পড়ার নির্দেশনা নিয়ে প্রথম ওহি অবতীর্ণ হয়। এরপর সূরা মুদ্দাসসির ও সূরা আদ-দোহা অবতীর্ণ হলে মহানবী (সা.) পুরোদমে তাওহিদ ও রিসালতের প্রচার শুরু করেন। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মিণী হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। [ইবনে ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.), বাতায়ন প্রকাশন, পৃষ্ঠা ১৩৭]

এরপর নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশনা জারি করা হয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

অর্থ : 'তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও।' (সূরা শু'আরা, আয়াত : ২১৪)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর নিকটতম ও বিশ্বাসযোগ্য লোকদের কাছে নবুয়তের কথা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে প্রথমবারেই 'লাব্বাইক' বলেছেন কয়েকজন আপনজন।

হযরত আলী (রা.), হযরত আবু বকর (রা.) জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.), উসমান ইবনে আফফান (রা.), জুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) ও তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)সহ মোট আটজন। পরে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.). আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (রা.)সহ প্রথম তিন মাসে মোট ৪০ জন মতান্তরে ৪১ জন ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃষ্ঠা ৫৯)

এরপর মাত্র তিন বছর সময়ে ১০০ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।

নবুয়তের প্রথম বছর রজব মাসে ১১ জন পুরুষ ও পাঁচজন নারী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.)ও ছিলেন। এটাই ইসলামের প্রথম হিজরত। তাঁদের অনেকে মক্কায় পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার খবর শুনে ফেরত এসেছিলেন। পরে যখন দেখা গেল, খবরটি অসত্য, তখন নবুয়তের সপ্তম বছর জাফর (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রায় ৮৬ জন পুরুষ ও ১৭ জন নারী সাহাবা দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এটি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় হিজরত। পরে তাঁরা সপ্তম হিজরিতে সেখান থেকে মদীনায় হাজির হয়েছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, আবিসিনিয়ায় ইসলামের প্রথম হিজরতকারীদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন। আর মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে আনুমানিক পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই নওমুসলিমরা ইসলামে দীক্ষিত

হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁদের জন্য ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানার ও শেখার ব্যবস্থা করা। সেই লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দলকে নিয়ে 'দারুল আরকামে' সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। এটি ছিল নওমুসলিম আরকাম ইবনে আবুল আরকামের বাড়ি। এ বাড়িতে মহানবী (সা.) দাওয়াতের কাজ করতেন। পাশাপাশি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে কোরআন, নামায ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আনুষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। তবে আরো একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর গৃহে 'দারুল আরকামের' আগে ইসলামের প্রথম উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করেছিলেন। সেখানে নামাযের প্রশিক্ষণ হতো, কোরআনের তেলাওয়াত হতো। (ড. আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসাা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ইফা, পৃষ্ঠা ৪৩)

পরে সেটি মসজিদে আবু বকর (রা.)-এ রূপ নেয়। সহীহ বোখারী শরীফের কিতাবুল কাফালায় বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, মসজিদে আবু বকরে কোনো মুয়াল্লিম ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) নিজেই সেখানে তা'লীমের কাজ আঞ্জাম দিতেন। এখানে অমুসলিম ছেলে-মেয়েরাও কোরআনের তেলাওয়াত শুনত।

ইবনে হিশাম হযরত ওমর (রা.)-কে উদ্ধৃত করে বলেন, খাত্তাবের কন্যা ও উমর (রা.)-এর বোন ফাতেমা ও তাঁর স্বামী সাঈদ বিন জায়েদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নিজ গৃহে একটি ইসলামী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ইবনে আবত (রা.) নামের একজন সাহাবী নওমুসলিমদের কোরআন শিক্ষা দিতেন।

এ আলোচনা থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.)-এর মক্কার জীবনে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায় ছিল ব্যক্তিগত। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আর যাঁরা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিতেন, তিনি তাঁদের অনানুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল গৃহে অথবা আঙিনায় মসজিদ বা মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যেমন আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর বোন ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে প্রতিষ্ঠিত মক্তব। তৃতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাফা-মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে 'দারুল আরকামে'।

মক্কাকেন্দ্রিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার এই ধারা কালক্রমে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়। হিজরতের আগেই এই স্রোত মদীনার অলিগলিতে প্রবাহিত হয়।

ইসলামের সবচেয়ে আলোচিত হিজরত হলো, মহানবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত। এ হিজরতের পটভূমি তৈরি হয়েছিল ঐতিহাসিক আকাবা নামক স্থানের শপথের মাধ্যমে। নবুয়তের ১১তম বছর মদীনার ছয়জন ঈমানদার আর ১২তম বছর ১২ জন আকবা নামক স্থানে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করার শপথ নেন। আর ১৩তম বছরে ৭৩ জন পুরুষ ও দুজন নারী মহানবী (সা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা মক্কার মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। মহানবী (সা.) সাহাবাদের মহরম মাস থেকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। মদীনায় সর্বপ্রথম হিজরত করেছেন মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)। আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যাতে তিনি তাঁর সঙ্গে হিজরত করতে পারেন। সাহাবাদের হিজরতের দুই মাস পর মহানবী (সা.) রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার হিজরত করেন। হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে আবু বকর ও তাঁর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা ও পথনির্দেশক আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত দুয়ালিও ছিলেন। তিনি বাইয়াতে আকাবার তিন মাস পর ২৭ সফর বৃহস্পতিবার রওনা দেন। তিন দিন 'ছুর' নামক পর্বতে গোপন থাকার পর সোমবার ১ রবিউল আউয়াল আবার রওনা দেন। ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি কুবা নগরীতে পৌঁছেন। ১৪ দিন অবস্থান করার পর তিনি সেখানে মসজিদে কুবা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি মদীনায় গমন করেন। (ইবনে কাছির, আল বিদায়া খণ্ড-৩, পৃ. ১৮৮)

হিজরতপূর্ব মক্কার আকাবা শপথের পর ইয়াসরিব তথা মদীনার নওমুসলিমদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসারে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ও মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) নামক দুজন সাহাবীকে মুয়াল্লিম হিসেবে প্রেরণ করা হয়। এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যায়, মক্কা ও মদীনায় ইসলামের তাবলীগী (দাওয়াতি) কার্যক্রম ও তা'লীমী (শিক্ষা) কার্যক্রম সমানতালে পরিচালিত হয়েছে। ইসলামের দাওয়াতের ইতিহাস ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসের সমবয়সী। তাবলীগ ও তা'লীম একটি আরেকটির সম্পূরক। উভয়ের মধ্যে বৈরিতা নেই, আছে বন্ধুত্ব।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

সততা এবং আমানতদারি

কারী জসীম উদ্দীন কাসেমী

ইসলামী আখলাকে সততা ও আমানত–এমন দুটি সম্পূরক গুণ, যেগুলি গ্রহণ করলে মানুষের সৎচরিত্রে পূর্ণতা লাভ করে। সততাহীন, আমানতহীন ব্যক্তিকে অসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। সত্যবাদিতার কারণে মানুষ সমাজে সম্মান পায়। সত্যবাদী ব্যক্তি মানুষের কাছে আস্থাভাজন হয়। মানুষ সততার বদৌলতে আরাম ও শান্তিতে বসবাস করে থাকে। সততার কারণে চেহারায়ও এক প্রকারের উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়, সততা মানুষকে মুক্তি দেয়। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস এবং বরবাদ করে দেয়। যে সততাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সর্বদা সত্য কথা বলে সে ধীরে ধীরে সিদ্দিকিয়্যাতের মাকাম ও মর্যাদা অর্জন করে। পক্ষান্তরে মিথ্যা মানুষকে একেবারেই ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যার কারণে মানুষের মান-সম্মান একেবারেই ম্লান হয়ে যায়। মিথ্যাবাদী মানুষের সুনজর থেকে পড়ে যায়। মিথ্যার কারণে আত্মার প্রশান্তি থেকেও মাহরূম হয়ে যায় মানুষ। রহমতের ফেরেশতা তার থেকে অনেক দূরে থাকে। শয়তান তাকে গ্রাস করে নেয়। মিথ্যা বলার অভ্যাস পাকাপোক্তা হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে তাকে (কাজ্জাব) মিথ্যাবাদী লিখে দেওয়া হয়।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় আছে :

عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضى اللّٰه عنه عن النَّبِىِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الجَنَّة ، وَإِنَّ الـرَّجُـلَ لِيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّـٰهِ صِـدِّيـقاً ، وإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الـفُـجُـورِ وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الـرَّجُـلَ لَيَـكْـذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّاباً متفقٌ عليه .

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য নিয়ে যায় জান্নাতের পানে। নিশ্চয়ই মানুষ যখন সর্বদা সততা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহর কাছে তাকে সত্যবাদী বলে তালিকাভুক্ত করা হয়। আর মিথ্যা অবশ্যই পাপাচারের পথ দেখায় এবং পাপাচার জাহান্নাম পানে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।" (বোখারী ও মুসলিম)

মিথ্যা শুধু একটি গোনাহ নয়, বরং সেটি হলো অনেক গোনাহের মূল ও ভিত্তি। তাই তো মিথ্যাকে বলা হয় (ام الامراض) রোগসমূহের মূল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" (সূরা আত-তাওবা, ১১৯)

আরেক আয়াতে আল্লাহ রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন :

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

"সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী (তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন)।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৫)

অন্য আয়াতে এসেছে :

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

"যদি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা তারা সত্যে পরিণত করত, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো।" (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ২১)

ওপরে উল্লিখিত তিরমিযী শরীফের হাদীসটি আরেক রেওয়ায়াতে এভাবে আসেছে :

عَنْ أبى مُحَمَّدٍ الْحَسنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أبى طَالِبٍ ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهما ، قَالَ حفظْتُ مِنْ رسـولِ الـلَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : دَعْ مـا يَـرِيبُكَ إِلَـى مَـا لا يَـرِيبُكَ ، فَإِنَّ الـصِّـدْقَ طُـمأنينَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيبةٌ رواه التِرْمذى وقال :حديثٌ صحيحٌ .

আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মুখস্থ করেছি যে, "যা তোমাকে সন্দেহে পতিত করে তা ছেড়ে দিয়ে তার দিকে যাও, যা তোমাকে সন্দেহে পতিত করে না। সততা ও সত্যবাদিতা নিশ্চয় প্রশান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।" (তিরমিযী শরীফ)

عنْ أبى سُفْيانَ صَخْرِ بْنِ حَربٍ .رضىَ اللّٰه عنه .فى حـديثه الطَّويلِ فى قِصَّةِ هِرقْلُ ، قَالَ هِرقْلُ :فَماذَا يَأْمُرُكُمْ يعْنِى الَـنَّبِـىَّ صَـلّـى الـلـهُ عَلَيْـهِ وسَلَّم قَالَ أَبُو سُفْيَانَ :قُلْتُ :يقولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لا تُشْـرِكُـوا بـه شَيْـئاً ، واتْرُكُوا ما يَقُولُ آبـاؤُكُـمْ ، ويَـأْمُرُنَا بالصَّلاةِ والصِّدقِ ، والْعفَافِ ، والصِّلَةِ .متفقٌ عليه.

হযরত আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে তিনি রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, হেরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করল, 'তিনি (মুহাম্মাদ) তোমাদের কী নির্দেশ দেন।' আবু সুফিয়ান বলেন, "আমি বললাম, তিন বলেন, 'তোমরা একমাত্র আল্লাহর

ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না। তোমাদের বাপ-দাদারা যা বলে, তা পরিত্যাগ করো।' আর তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যবাদিতা, কারো কাছে না চাওয়া ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضى اللَّهُ عنه قال :قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : غزا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صلواتُ اللَّه وسلامُهُ عليهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ :لا يَتْبَعْنِى رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ .وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِها ، ولا أَحدٌ بنى بُيُوتاً لَمْ يرفَعْ سُقُوفَهَا ، ولا أَحَدٌ اشْترى غَنَماً أَوْ خَلَفَاتٍ وهُو يَنْتَظِرُ أَوْلادَهَا .فَغَزَا فَدنَا مِنَ الْقَرْيَة صلاةَ الْعصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلكَ ، فَقَالَ لِلشَّمس :إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وأَنا مأْمُورٌ ، اللهمَّ احْبسْهَا علَينا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عليْه ، فَجَمَعَ الْغَنَائِم ، فَجاءَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعمْهَا ، فقال :إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فليبايعنى منْ كُلِّ قبيلَةٍ رجُلٌ ، فلزقتْ يدُ رَجُلٍ بيدِهِ فَقَال :فِيكُم الْغلولُ ، فليبايعنى قبيلَتُكَ ، فلزقَتْ يدُ رجُلَيْنِ أو ثلاثَة بيَدِه فقال : فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فجاءوا برَأْسٍ مِثْلِ رَأْس بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهبِ ، فوضَعها فَجاءَت النَّارُ فأَكَلَتَها ، فلمْ تَحل الْغَنَائمُ لأحدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنا الغنائمَ لَمَّا رأَى ضَعفَنَا وعجزنَا فأحلَّها لنَا متفقٌ عليه .

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"কোনো একজন নবী যুদ্ধে যাওয়ার সময় তাঁর অনুসারীদের বললেন, যে ব্যক্তি বিয়ে করেছে, স্ত্রীর সঙ্গ লাভ করতে চায়; কিন্তু এখনো করেনি এবং যে ব্যক্তি ঘর নির্মাণ করেছে; কিন্তু এখনো ছাদ দেয়নি আর যে ব্যক্তি বকরি বা উট ক্রয় করে তার বাচ্চার অপেক্ষায় আছে, তারা যেন যুদ্ধে আমার সাথে যোগ না দেয়। এরপর তিনি যুদ্ধে রওনা হয়ে গেলেন। আসরের নামায অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে যুদ্ধের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেলেন। এরপর তিনি সূর্যকে বললেন, তুমি আল্লাহর আদেশের অনুগত আর আমিও তাঁর অনুগত। হে আল্লাহ! আপনি সূর্যকে আমাদের জন্য আটকে রাখুন। ফলে সূর্যকে আটকে রাখা হলো যুদ্ধ জয় না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর তিনি যুদ্ধলব্ধ সকল মাল-সম্পদ একত্রিত করে রাখলেন, যাতে আগুন এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। আগুন এল; কিন্তু সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিল না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খিয়ানত করেছে। তাই প্রত্যেক গোত্রের একজন করে আমার হাতে শপথ নেবে। এভাবে শপথ নেওয়ার সময় একজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমাদের (গোত্রের) মধ্যে খিয়ানতকারী রয়েছে। তাই তোমার গোত্রের সব লোককেই আমার হাতে শপথ নিতে হবে। এভাবে শপথ নেওয়ার সময় দুজন বা তিনজনের হাত তাঁর হাতে আটকে গেল। তখন তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে। এরপর তারা একটি গরুর মাথার পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা হাজির করল। সেটাকে তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে রাখলেন। এরপর আগুন এসে সব জ্বালিয়ে দিল। আমাদের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনিমত) কারো জন্য হালাল করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অপারগতার প্রতি লক্ষ রেখে আমাদের জন্য এটা হালাল করে দিয়েছেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

عن أبى خالدٍ حكيمِ بنِ حزَامٍ .رضَىَ اللَّهُ عنه ، قالَ :قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : الْبيِّعَان بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا ، فإِن صدقَا وبيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما ، وإِن كَتَما وكذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيْعِهِما متفقٌ عليه .

হযরত আবু খালেদ হাকীম ইবনে হিযাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয় বাতিল করে দেওয়ার অধিকার রাখে যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং স্পষ্ট বর্ণনা দেয় তবে তাদের বেচা-বিক্রিতে বরকত হয়। আর যদি তারা (পণ্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে তাহলে তাদের কেনা-বেচার বরকত বিনষ্ট করে দেওয়া হয়।"

(বোখারী ও মুসলিম)

উল্লিখিত কোরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম ইসলাম সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব কতটুকু এবং সততা ও সত্যবাদিতার আলোকরশ্মি কী পরিমাণ বিস্তৃত। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে বরকত প্রাপ্তি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে আমাদের অবশ্যই সততা ও সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

আমানত :

মানব জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো আমানতদারি, যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী কারীম (সা.) বলেছেন, ওই ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হয়নি, যার কাছে কোনো আমানতদারি নেই। যেমন–হাদীস শরীফে এসেছে,

হযরত আনাস (রা.) বলেন, এমন কমই হয়েছে যে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো বক্তৃতা করেছেন, অথচ আমানত প্রত্যর্পণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। তিনি বলেছেন, যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার পূর্ণ ঈমান নেই, আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার প্রবণতা নেই,

তার মধ্যে পূর্ণ দ্বীন নেই। [মুসনাদে আহমদ : হাদীস ১২৫৬৮, ১৩১৯৯]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরা নিসা : আয়াত ৫৮]

হাদীস শরীফে এসেছে–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে মুনাফেকের কয়েকটি পরিচয়ের মধ্যে একটি পরিচয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত করে। [সহীহ বোখারী, হাদীস : ২৬৮২, ২৭৪৯; সহীহ মুসলিম : হাদীস ৫৯]

সাধারণত মানুষ আমানতদারি বলতে এটা বোঝে যে কেউ কিছু টাকা-পয়সা অথবা কোনো বস্তু আমার কাছে রাখতে দিল, আমি সেটিকে ব্যবহার করিনি, সেটিতে কোনো খিয়ানত করিনি, যে রকম দিয়েছিল, সে রকমই ফেরত করেছি। তাহলে আমানতের হক আদায় হয়ে গেল। নিশ্চয়ই আমানতের এটি একটি অংশ।

সূরা নিসার যে আয়াতটির তরজমা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, তাতে 'আমানত' শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে অন্যের কাছে অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখাই কেবল আমানত নয়, যাকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারে আমানত বলা এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো অনেক প্রকার রয়েছে। উক্ত আয়াতের শানে নুযুলের ঘটনায় কা'বা শরীফের চাবি প্রত্যর্পণের যে প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে তাও কোনো গচ্ছিত অর্থসম্পদের আমানত নয়, বরং এটি ছিল কা'বা শরীফের খিদমতের দায়িত্ব সম্পাদনের ভার ন্যস্তকরণ। [মাআরিফুল কোরআন, পঞ্চম পারা, পৃ. ৯৭]

বোঝা গেল, কোরআন এবং হাদীসে যেখানে আমানত শব্দ এসেছে তার অর্থ আরো অনেক ব্যাপক, আরো অনেক কিছুই এই আমানতের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। আমানতে সর্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত বস্তু হলো আমাদের জীবন, যা আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছি। অনুরূপভাবে আপাদমস্তক মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর হলো আমানত। এগুলোর আসল মালিক আমরা নই। এই চক্ষু, যা দিয়ে আমরা দেখতে পাই; এই জিহ্বা, যা দিয়ে আমরা বলতে পারি; এই কান, যা দিয়ে আমরা শ্রবণ করে থাকি; এই নাক, যা দিয়ে আমরা ঘ্রাণ নিতে পারি; এই হাত, যা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি এবং এই পা, যা হাঁটাচলার জন্য ব্যবহার হয়। এগুলো সবই হলো এমন আমানত, যা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের কোনো মেহনত ছাড়াই শুধু দয়া করে দান করেছেন। দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকারের ক্ষেত্রে এগুলোকে ব্যবহার করা এবং এই শক্তিগুলো থেকে উপকৃত হওয়াটাও আমানত। এই অঙ্গগুলোকে আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে খিয়ানত। তেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, যেগুলো অবাধে চলে যাচ্ছে–এগুলোও আল্লাহ তা'আলার আমানত। এই মুহূর্ত ও সময়গুলিকে এমন কাজে ব্যবহার করা, যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে মঙ্গল হয়, সেটি হবে আমানতদারি এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি ও তার অসন্তুষ্টির কাজে জীবন যাপন করা হলো আমানতের খিয়ানত। বক্তব্যের মূল বার্তা হলো এই, আমানত ও দ্বীয়ানতের সম্পর্ক শুধু কোনো বস্তু বা টাকা-পয়সার সাথে নয় বরং আমানতের মধ্যে প্রত্যেক ওই বস্তু অন্তর্ভুক্ত, যার সাথে কারো না কারো হক অবশ্যই জড়িয়ে থাকে। যাকে সংরক্ষণ করা এবং মালিকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব (আদায়করণ) তার ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে। অতএব বলা যেতে পারে যে আলেমের কাছে এলম হলো আমানত, কোনো মসজিদ, মাদরাসার মুতাওয়াল্লির কাছে মসজিদ-মাদরাসা হলো আমানত। ক্ষমতাসীনদের কাছে ক্ষমতা হলো আমানত, ধনাঢ্যদের কাছে ধন-সম্পদ হলো আমানত। মাদরাসা-মক্তব ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে ছাত্র হলো আমানত, মা-বাবার কাছে সন্তান হলো আমানত। স্ত্রীর কাছে ইজ্জত-আব্রু হলো আমানত, প্রতিটি মানুষের কাছে তার প্রাণ ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো আমানত, আমাদের পুরো জীবনটাই এবং প্রতিটি মুহূর্ত হলো আমানত।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনে এই দুটি গুণ ছিল খুবই প্রকাশ্য। বাল্যকাল থেকেই তিনি সততা ও আমানতের পূর্ণ ধারক-বাহক ছিলেন, নবুওয়াতের পূর্বেও পুরো মক্কা শরীফে তিনি (সাদেক) সত্যবাদী (আমীন) আমানতদার উপাধি দ্বারা খ্যাত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সর্বদা সত্য কথাই বলতেন। তাঁর মুখে কোনো দিন মিথ্যা কথা উচ্চারিত হয়নি। তিনি যেহেতু আমানতদার ছিলেন তাই লোকেরা তাঁর কাছে আমানত রাখত, তাদের আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যে তিনি আমাদের আমানত

আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন। হিজরতের সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে কাফেররা তো সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন করছিল, নবী কারীম (সা.)-কে প্রাণে শেষ করে দেওয়ার জন্য অনেক মারাত্মক কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার আদেশে রাতেরবেলায় মক্কা শহর থেকে হিজরত করতে হলো। এমন নাজুক প্রতিকূল পরিবেশেও (যখন তাঁর কাছে মানুষের আমানত ছিল) তখনও তাঁর চিন্তা ও বেদনা ছিল যে আমার কাছে যাদের আমানত আছে যদি তাদেরকে আমানত ফেরত দিয়ে দিতে যাই তাহলে আমার হিজরতের এই ভেদ প্রকাশ হয়ে যাবে যে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এ সময় রাসূলে কারীম (সা.) যার যার আমানত তার তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতি এমনভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যে তিনি এই কাজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত আলী (রা.)-কে নিয়োগ দিয়েছেন। যার যার আমানত তার তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে আদেশ দিয়েছেন। এ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পরেই তিনি হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওনা করলেন। ওই আমানতগুলো শুধু মুসলিমদের ছিল তাই নয় বরং সেখানে কাফেরদের আমানতও ছিল। যারা তাঁর রক্তপিপাসু এবং প্রাণের দুশমন, প্রকৃত শত্রু ছিল তাদের আমানতও তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সততা আমানতদারির ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সীরাত ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল।

শাসনকর্তার হাতে দেশ ও জনগণ আমানত :

এক হাদীসে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যার ওপর সাধারণ মুসলমানের কোনো কর্তৃত্ব অর্পিত হয় এবং সে উক্ত কর্তৃত্ববলে কাউকে যোগ্যতা যাচাই না করে কেবল বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো পদ বা দায়িত্ব দান করে তার প্রতি আল্লাহর লানত রয়েছে। তার ফরয-নফল কিছুই কবুল হবে না। ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। [জামউল কাওয়ায়েদ, পৃ. ৩২৫]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কাউকে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করে, অথচ সে জানত যে যাকে সে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তার চেয়ে অধিক যোগ্য অন্য ব্যক্তি রয়েছে, তবে সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। [তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, ১১ খ, পৃ. ১১৪, হাদীস ১১২১৬]

পরামর্শও আমানত

অন্য এক হাদীসে এসেছে। অর্থাৎ যার কাছে কোনো পরামর্শ চাওয়া হয়, সে সেই বিষয়ের জন্য আমানতদার। তার কর্তব্য এমন পরামর্শ প্রদান করা, যার তার জ্ঞান অনুযায়ী পরামর্শ প্রার্থীর জন্য অধিক কল্যাণকর হয়। যদি সে জেনেশুনে তার ব্যতিক্রম পরামর্শ দেয় তবে সে আমানত খিয়ানতের গোনাহ করল। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮২৬৭, ২২৩৫৯, ২২৩৬০; সুনানে দারেমী, হাদীস ২৪৯৩,২৬৩৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১২৮; সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৮২২, ২৮২৩, ২৩৬৯]

বোঝা গেল, ইসলামে অমানত শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। যার ওপর যার যে হক রয়েছে, সেগুলোও সব আমানত। বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর হক, মাতা-পিতার হক, পাড়া-প্রতিবেশীর হক, ছেলে-সন্তানের হক। মোটকথা, সবই আমানতের শামিল। সুতরাং ইসলাম যেভাবে আমানত রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে, সেভাবে রক্ষা করা হলে দুনিয়ায় শান্তি আর শান্তির আবহ সৃষ্টি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তবে বর্তমানে মুসলিম সমাজের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা হলো এই, মিথ্যা, খিয়ানত, ধোঁকাবাজির মতো আরো অনেক কুচরিত্রের খারাবি ও মন্দত্ব মুসলমানদের অন্তর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। এগুলোকে এখন জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেক ও হুঁশিয়ারি বলে নাম দেওয়া হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে গোনাহ এবং গোনাহের খারাবি-মন্দত্বই অন্তর থেকে বের হয়ে যাওয়া। ইসলামের পবিত্র শিক্ষা শুধু মুসলমানদের জন্য তা নয় বরং প্রত্যেক মানবের জন্য প্রকাশ্য কিতাব, যে জাতি বা যে দেশ ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী কালচার গ্রহণ করেছে এবং এগুলোকে আমলী জীবনের অংশ বানিয়েছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে উন্নত ও ভদ্র জাতি এবং মুসলমানরা নিজের পবিত্র ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে অনুন্নত জাতি। পরাজিত জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। যদি আমরা সত্যিই ইসলামের পতাকাবাহী জাতি হয়ে থাকি এবং উন্নত জাতি ও ভদ্র মানব হিসেবে জীবন যাপন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অতীতকে ভুলে যাওয়া এবং ছেড়ে দেওয়া ইতিহাস ও সবকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে। একে পুনরায় উজ্জীবিত করতে হবে, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম কর্তৃক দিকনির্দেশনা সমাজের প্রতিটি সেক্টরে বাস্তবায়ন করতে হবে। যেগুলোর ওপর আমল করলে বাস্তবে ও নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ ও কামিয়াবী অর্জিত হবে এবং সমাজও আমাদের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাবে ইনশাআল্লাহ।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মোবাইল, ফেসবুক ইত্যাদির ব্যবহার

মুহাম্মদ যাইনুল আবেদিন
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(১) মোবাইল ফোন বা ডিজিটাল ক্যামেরার মাধ্যমে মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি তোলা এবং ভিডিও করা জায়েয কি না? কিংবা কারো তোলা ছবি বা বিভিন্ন ভিডিও ফাইল ব্লুটুথের মাধ্যমে মোবাইল মেমোরিতে এনে সংরক্ষণ করা এবং মাঝেমধ্যে এগুলো ওপেন করে দেখা জায়েয কি না?

(২) ভিডিও মোবাইল ফোনসেট ব্যবহার করা জায়েয কি না? সাধারণত এই সেটের অতিরিক্ত উপকার হলো ছবি তোলা, ভিডিও রেকর্ড করা, ওয়াজ-নসিহত, গান-বাজনাসহ ভালো-মন্দ বিভিন্ন ফাইল ওপেন করে দেখা বিভিন্ন সফটওয়্যারের ব্যবহার করা, নেট থেকে ডাউনলোড করে ইসলামিক বা অনৈসলামিক বই-পুস্তক পড়া, অনলাইনে একজন আরেকজনকে দেখে ভিডিও কল করা, ফেসবুক ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা ইত্যাদি।

(৩) বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত ইন্টারনেটভিত্তিক একটি যোগাযোগ মাধ্যমের নাম ফেসবুক। যার অধিকাংশ ব্যবহারকারী ফাসেক তরুণ-তরুণী ও সাধারণ মানুষ। ওই ফেসবুকে ইচছামতো প্রেম-প্রীতি, নারী-পুরুষের বৈধ-অবৈধ চেটিং চলে এবং ভালো-মন্দ বিভিন্ন ভিডিও, অডিও ফাইল ও ছবিসংবলিত নিউজ, বিভিন্ন লেখা ও মতামত একে অপরে শেয়ার করে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। একজন ফেসবুক ব্যবহারকারীর নজরে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারীর ছবি পড়বে না, তা অবশ্যই কোনো ব্যবহারকারী অস্বীকার করতে পারবে না। তবে কেউ কেউ দ্বীন-ধর্মের দাওয়াতের দোহাই দিয়ে ফেসবুক ব্যবহার করে টুকটাক ইসলামী লেখা নিজে লিখে এবং সাথে সাথে অনেক ফাসেকদের ফাসেকী লেখাও পড়ে, অডিও, ভিডিও ও বিভিন্ন চিত্র দেখে একজন মুফতী সাহেবকে ফেসবুকের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ফেসবুকে যতখানি ভালো আছে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো আছে টিভিতে এবং টিভিতে যতখানি খারাবি আছে তার চেয়ে অনেক বেশি খারাবি আছে ফেসবুকে। সুতরাং টিভি দেখা ও ঘরে রাখা যখন নাজায়েয তাহলে ফেসবুক আইডি ওপেন করা ও ফেসবুক ব্যবহার অবশ্যই নাজায়েয হবে। ধর্মপ্রাণ এক ফেসবুক ব্যবহারকারীকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই! যারা ফেসবুকে ইসলামী পেজ ওপেন করে এবং ইসলামী লেখালেখি করে তাতে কি উপকার হচ্ছে? জবাবে তিনি বললেন, এটা একটা শয়তানি। আগুনের গর্তে কেউ পড়ে গেলে গর্তের বাইরে থেকে পড়ন্ত ব্যক্তির উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে আগুনের গর্তে নিজেও লাফ দিয়ে তাকে রক্ষা করা যাবে না। বরং নিজে শুদ্ধ জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাবে। বহু যাচাই-বাছাই করে অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারীকে জিজ্ঞেস করে দেখা গেছে সঠিক বিবেচনায় এই ফেসবুকে ইসলামের লাভের তুলনায় ক্ষতিই বেশি বরং কেউ কেউ বলে থাকে পুরোটাই ক্ষতি। জনাব মুফতী সাহেব! এখন আমার জিজ্ঞাসা হলো, ফেসবুক ব্যবহার করা জায়েয কি না? এবং দাওয়াতের দোহাই দিয়ে অনলাইনভিত্তিক ফাসেকদের এই আড্ডাখানায় ফেসবুকে যুক্ত হওয়া আমাদের জন্য বৈধ কি না? উল্লিখিত মুফতী সাহেবের কথা সঠিক কি না? এবং এই ফেসবুকের ব্যাপারে আপনার ধারণা ও মতামত কী? মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকর ও নিরাপদ ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার সুচিন্তিত মতামত ও যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ জানালে আমরা অনেক উপকৃত হতাম ও গোটা মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হতো।

সমাধান :

ইসলাম যেভাবে অশ্লীল ও বেহায়াপনাকে হারাম করেছে অনুরূপ এর সকল উপকরণও বন্ধ করেছে। ইসলামের একটি মুলনীতিই হচ্ছে 'সদ্দে বাব' তথা গোনাহের উপায়-উপকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ। যেমন–অন্যের দেবতাকে গালমন্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে যেন অজ্ঞতাবশত তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে গালি না দেয়। অন্যের পিতাকে গালি দিতে মানা করা হয়েছে। যাতে নিজের পিতার মান বাঁচে। ভিন পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা পায়। এসব বিধান মূলত ইসলামের পূর্ণতা, দূরদর্শিতা ও কল্যাণকামিতার পরিচায়ক। ইসলামের দৃষ্টিতে গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া যেমন হারাম, তদ্রূপ গোনাহের উপকরণ অবলম্বনও হারাম। যে সকল উপকরণ

দিয়ে সরাসরি গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয়, কোনোরূপ কারিগরি সহায়তা বা কসরতের প্রয়োজন হয় না, এমন উপকরণকে সরাসরি গোনাহের কার্যকারণ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। যেমন সন্ত্রাসীদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা। মুফতী শফী (রহ.) বলেন :

وان لم يكن محركا وداعيا بل موصلا محضا وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لايحتاج فى إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من فاعل كبيع السلاح من اهل الفتنة۔

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে, মানুষের আমল-আখলাকের তত অবনতি হচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহারে শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো যে সকল যন্ত্র জায়েয কাজে ব্যবহার সম্ভব হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণত গোনাহের কাজেই তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এমন যন্ত্র নাজায়েয কাজে ব্যবহার তো নাজায়েয বটেই, জায়েয কাজেও এর ব্যবহার মাকরূহ।

ایسے آلات جو اگرچہ جائز کاموں میں بھی استعمال ہوسکتے ہیں لیکن عادۃ انکو لہو ولعب اور ناجائز کاموں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسے گرامن فون وغیرہ انکا استعمال ناجائز کاموں میں تو ناجائز ہے ہی، جائز کاموں میں بھی انکا استعمال کراہت سے خالی نہیں۔ (آلات جدیدۃ کے شرعی احکام/۱۶، امداد الفتاوی ۸۴۳/۱)

গোনাহ মূলত আগুনের সাদৃশ্য, আগুন থেকে বাঁচতে হলে যেভাবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয়, অনুরূপ গোনাহ থেকে বাঁচতে হলেও নিরাপদ দূরে থাকা আবশ্যক, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن۔

অর্থ : নির্লজ্জতার কাছেও যেও না প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। (আল আনআম-১৫১)

কাছে না যাওয়ার অর্থ : গোনাহের স্থান, কাল, পাত্রসহ এমন সকল উপায়-উপকরণ থেকে বেঁচে থাকা, যার দ্বারা গোনাহের পথ খুলে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে :

من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه۔

অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়। কোরআন-সুন্নাহর এ সকল মূলনীতির ভিত্তিতে আপনার প্রশ্নসমূহের উত্তর নিম্নরূপ :

১. শরীয়তসম্মত জরুরত ছাড়া মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি তোলা এবং ভিডিও করা ও করানো এগুলোর সংরক্ষণ, দর্শন ও প্রদর্শন সর্বাবস্থায় হারাম। (বোখারী শরীফ-২/৯৩৭৪, উমদাতুল ক্বারী-২২/৭০, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১২/৩৪৮)

২. মোবাইল ফোন বিজ্ঞানের এমন এক আবিষ্কার, যার উপকারী দিকের চেয়ে ক্ষতির পাল্লা অনেক ভারী। এ কথাটি অনস্বীকার্য এক বাস্তব সত্য। তাই ঢালাওভাবে এর ব্যবহারের বৈধতা দেওয়া যায় না। বিশেষ করে যে সকল সেটের মাঝে গোনাহের সব ধরনের সরঞ্জাম যোগ করা হয়েছে, তার বৈধতা নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। ছবি, ভিডিও, নাচ, গান ইত্যাদি পৃথক পৃথকভাবে যদি হারাম হয় তবে যে সকল সেটে এসবের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, তার হুকুম কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। গোনাহের দরজা বন্ধের মূলনীতির দিকে তাকালে এমন সেটের ব্যবহার বৈধ হতে পারে না। ক্যামেরা, ভিডিওযুক্ত মোবাইল ফোনসেট গোনাহের এমন একটি উপকরণ, যার মাধ্যমে গোনাহে লিপ্ত হতে শুধু ব্যবহারকারীর ইচ্ছাই যথেষ্ট, কোনোরূপ কারিগরি যোগ করার প্রয়োজন হয় না। গোনাহের এমন কার্যকারণকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় سبب موصل তথা পরিবাহী কার্যকারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। গোনাহের এমন উপকরণ অবলম্বন নাজায়েয। যদিও গোনাহমুক্ত কাজে এ ধরনের সেট ব্যবহার করা সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ ব্যবহারকারীই এর মাধ্যমে গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে। ক্যামেরা-ভিডিওযুক্ত মোবাইল ফোনসেট হাতে আছে অথচ তাতে কোনো প্রাণীর ছবি নেই, এমন সেট পাওয়া যাওয়া দুষ্কর। এই সরল সত্য আর বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ধরনের সেটের উদ্দেশ্যটাই একটু আলাদা। দেখা যায় কথা বলার জন্য থাকে একটি নরমাল সেট আর দেখা-শোনার জন্য থাকে ভিন্ন সেট। তাই নরমাল সেট থেকে এর হুকুমটাও ভিন্ন হতে বাধ্য। বলতে গেলে এ ধরনের সেট পকেট টেলিভিশনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা টিভির খারাবিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের এ যন্ত্রটি যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোনাহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে জায়েয হবে না। গোনাহমুক্ত সেট দিয়ে প্রয়োজন পুরা করতে হবে। (আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের-১০২, দূররে মুখতার ৬/৩৯১ আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৮/৪২৮, রদ্দুরল মুহতার-৬/৩৯১)

৩. হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, চোখের যিনা দৃষ্টি। ফেসবুকে প্রবেশ করলে দৃষ্টির গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে এটা মিথ্যার মোহনাও বটে, বিধায় এর ব্যবহার গোনাহের سبب محرك তথা উৎসাহনীয় কর্মকারণ অথবা কম করে হলেও سبب

موصل পরিবাহী কার্যকারণ তো বটেই। অতএব ব্যাপকভাবে এর ব্যবহারও জায়েয হবে না। একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নজর হেফাজতের সক্ষমতার শর্তে সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা যাবে। (সূরা আনআম-১০৮, মাআরিফুল কোরআন-৩/৪২১, আহসানুল ফাতাওয়া-৮/১৯ মাওসুআতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা ৫/৩১৫)

প্রসঙ্গ : হাফ ভাড়া

মাও. শরিফুল ইসলাম
হালশা, নাটোর।

জিজ্ঞাসা :

বাংলাদেশ সরকারের নিয়মানুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা পাবলিক যানবাহনে হাফ ভাড়া দিতে পারে। আমার জানার বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েয কি না? বিশেষ করে মাদরাসাপড়ুয়া ছাত্ররা, যারা সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয়। এদের জন্য হাফ ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

ছাত্র-ছাত্রী সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোক বা না হোক, গাড়ির মালিকের সন্তুষ্টিতে হাফ ভাড়া দেওয়া বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। তবে সরকারি গাড়িতে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হাফ ভাড়া দেওয়ার অবকাশ আছে। (আদ দুররুল মুখতার-৬/৩৯৯, ইসলাম আউর জদীদ মা'শিয়ত-৪৯)

প্রসঙ্গ : ওজু

মুহাম্মদ জুনাইদ আহমদ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

চোখ ওঠার পর চোখ থেকে যে পানি বের হয় এর দ্বারা ওজু ভাঙবে কি না? এবং শরয়ী মাজুর বলে বিবেচিত হবে কি না? মাসআলাটির সঠিক সমাধান শরীয়তের দলিল দ্বারা জানতে চাই।

সমাধান :

চোখ ওঠা রোগীর চোখ থেকে পুঁজের মতো পিছলা ঘোলা জাতীয় পানি বের হলে ওজু ভেঙে যাবে। এমতাবস্থায় পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওই রোগীকে মাজুর গণ্য করা হবে সে প্রত্যেক ওয়াক্তে ওজু নবায়ন করবে। আর এমন রোগীর চোখ থেকে স্বাভাবিক পানি বের হলে ওজু ভাঙবে না। (রদ্দুল মুহতার-১/১৪৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১১, ফতহুল কদির-১/১৬৪)

প্রসঙ্গ : ঋণ প্রদান

মুহাম্মদ আলতাফ
মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার লোকেরা ব্যাপকহারে একটি লেনদেন করে থাকে তা হলো, কারো একসাথে অনেক টাকার প্রয়োজন হলে সে যেকোনো একজনকে বলে যে, আমার তো এত টাকার প্রয়োজন আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা। অতএব আমি একটি জমি খোরাকি হিসেবে এত টাকার বিনিময়ে দিতে চাই। প্রতি বছর ২০০-৩০০ টাকা করে কর্তন করে পরে যখন আমি টাকা ফেরত দেব তখন জমি ফেরত নিয়ে নেব। আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত লেনদেনটি শরীয়ত অনুযায়ী হয়েছে কি না দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

বি.দ্র.: এ ক্ষেত্রে সাধারণ ভাড়া থেকে অনেক কম ভাড়া নির্ধারণ করা হয়, যেমন ১০০০ টাকার জাগায় ১০০-২০০ টাকা ভাড়া হিসেবে ধার্য করা হয়, ভাড়াটে, খোরাকি শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে কাউকে ঋণ দিয়ে কোনোরূপ মুনাফা ভোগ করা বৈধ নয়, বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত লেনদেনটি শরীয়তসম্মত নয়। আর এ ধরনের সুদি লেনদেন থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। (ইলাউস সুনান-১৩/৬৪৪২, রদ্দুল মুহতার-৬/৫১১, ইমদাদুল আহকাম-৪/৫০১)

প্রসঙ্গ : ডিম ফোটানো

মুহাম্মদ ইসমাঈল আকন্দ
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় বহুল প্রচলিত যে হাঁসের ডিম মুরগি দ্বারা ওম দিয়ে হাঁসের বাচ্চা ফোটানো হয়। অনেক ব্যক্তি বলে, তা ঠিক নয়। এখন জানার বিষয় হলো, তা কতটুকু শরীয়তসম্মত? জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

হাঁসের ডিম মুরগির দ্বারা তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। (দুররুল মুখতার-৬/৩৮৮, হিদায়া-৪/৪৭৪)

প্রসঙ্গ : সফরের সীমানা

মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ
মতলব, চাঁদপুর।

জিজ্ঞাসা :

মুসাফির ব্যক্তি তার নিজ শহর থেকে বের হওয়ার পর কসর করবে। এখন জানার বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজ শহরের সীমানা কতটুকু তথা গ্রাম না ইউনিয়ন, না থানা, না জেলা না অন্য কিছু? এ বিষয়টা নিয়ে খুবই জটিলতার মধ্যে আছি। তাই হযরতের নিকট উক্ত বিষয়ে দলিলসহ সবিস্তারে জানানোর আবেদন রইল।

সমাধান :

শহরে বসবাসকারী ব্যক্তি শহরের যেদিক দিয়ে বের হবে সেদিকের শহরের আবাদি বা সীমানা অতিক্রম করার পর কসর শুরু করবে আর গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি নিজ গ্রামের আবাদি বা সীমানা অতিক্রম করার পর কসর

শুরু করবে। (আদ-দুররুল মুখতার-২/৫৯৯, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৯, ফতওয়ায়ে রহিমিয়া-৬/৩৬৪)

প্রসঙ্গ : মীরাছ

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান

জিজ্ঞাসা :

আমাদের পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে তারা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ২ আনার মালিক হইতে পারে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়ত মোতাবেক সঠিক ফয়সালা লিখিতভাবে প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সমাধান :

স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী স্বামীর সম্পদের মালিক নয়। বরং স্বামীই মালিক। স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশ হিসেবে স্ত্রী স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ হতে মীরাছ পাবে। স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী কোনো ধরনের মীরাছের দাবি করতে পারে না। তবে স্বামী জীবদ্দশায় চাইলে স্ত্রীকে হেবা/দানস্বরূপ শরীয়তসম্মত পন্থায় কিছু দিতে পারে। (সূরা নিসা-১৬, রদ্দুল মুহতার-১০/৫৩২, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৭/৪৫৮)

প্রসঙ্গ : মীরাছ

মাও. মোস্তফা ফরাজি
রামগতী, লক্ষ্মীপুর।

জিজ্ঞাসা :

যৌথ মীরাছি সম্পদ হতে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণের জন্য টাকা-পয়সা ও জমিজমা সদকা করা যাবে কি না? আমার জানার বিষয় হলো, জনাব নুরুল আমিন সাহেব বিগত কয়েক বছর আগে মারা যান, তিনি স্ত্রী, বালেগ ও নাবালেগ ছেলে-মেয়ে টাকা-পয়সা ও জমি জমা রেখে যান। এখন আমার প্রশ্ন হলো, জনাব নুরুল আমীন সাহেবের স্ত্রী ও বালেগ-নাবালেগ ছেলে-মেয়ের যৌথ সম্পদ হতে মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণের জন্য টাকা-পয়সা ও জমিজমা সদকা করতে পারবেন কি না? মুফতী মহোদয়ের নিকট আবেদন এই যে উক্ত বিষয়টির সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

বালেগ-নাবালেগের যৌথ সম্পদ বণ্টনের পূর্বে সদকা করা বৈধ নয়। প্রত্যেকের অংশ বণ্টন করে দেওয়ার পর স্ত্রী এবং বালেগ ছেলে-মেয়েরা তাদের অংশ হতে স্বেচ্ছায় মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণের জন্য টাকা-পয়সা ও জমিজমা সদকা করতে পারে, আর নাবালেগ ছেলে-মেয়ের সম্পদ হতে সদকা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ-২/৭৩৫, রদ্দুল মুহতার-৬/৬৫১)

প্রসঙ্গ : দরূদে নারিয়া

মাও. আবু সাঈদ
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

একদিন আমরা দরূদে নারিয়ার প্রসঙ্গে কথা বলি, আমাদের মধ্য থেকে একজন মুফতী সাহেব অন্য এক বিজ্ঞ মুফতী সাহেবের কথা নকল করে বলেন, দরূদে নারিয়ায়

(الذى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج الخ)

এই দরূদটির এই বাক্যে শিরকী কথা আছে। তাই দাওয়াত পড়া যাবে না। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত কথা সঠিক কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লিখিত দরূদ শরীফের উদ্ধৃত শব্দগুলো দ্বারা রাসূল (সা.)-কে উসিলা বানিয়ে দরূদ দু'আ করাই উদ্দেশ্য। এরূপ উদাহরণ হাদীস শরীফেও পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত দুরূদ শরীফে শিরকী কথা আছে, এমন বলা সঠিক নয়। (বোখারী শরীফ-১/১৩৭, আহকামুল কোরআন-৩/৫০২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৮/৪৯৯)

প্রসঙ্গ : সুদি ব্যাংক

মাওলানা আব্দুর রহমান
শালগাড়িয়া, পাবনা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি সোনালী ব্যাংকে চাকরি করে এবং সেই বেতন দিয়েই সংসার চলে। তখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যাংকে চাকরির টাকা জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রসন্তানকে ব্যবসা করার জন্য দিলে তা ছেলের জন্য নেওয়া যাবে কি না? এবং জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া (সোনালী ব্যাংকের বেতন থেকে অর্জিত) সম্পত্তি ছেলের জন্য নেওয়া বৈধ হবে কি?

সমাধান :

সুদি লেনদেনের ন্যায় সুদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম যেমন–লেখালেখি, সাক্ষ্য প্রদান, ইত্যাদিও হারাম। আর হারাম কাজের বিনিময় নেওয়া বা হারাম মাল থেকে বেতন নেওয়া কোনোটিই বৈধ নয়। তাই সোনালী ব্যাংকসহ যেকোনো সুদি ব্যাংকের চাকরির বেতন সম্পূর্ণ সুদের হতে দেওয়া হলে তা হালাল নয়। এ ধরনের টাকা দিয়ে উক্ত ছেলের জন্য ব্যবসা করা ও মীরাছ হিসেবে নেওয়া কোনোটিই বৈধ নয়। ওই টাকা পুরোটাই সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ বেতন সুদের টাকা হতে দেওয়া না হলে তাকে হারাম বলা যাবে না। এবং এ ধরনের টাকা দিয়ে ব্যবসা করা এবং মীরাছ হিসেবে নেওয়া জায়েয হবে। (মুসলিম শরীফ-২/৭২, ফাতাওয়ায়ে উসমানী-৩/৩৯৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৫/৩৬৩)

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-১৬

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

(নভেম্বর ২০১৭-এর পর)

আল্লাহ তা'আলা নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান ৬ :

গত পর্বে কথিত সলফীদের বিভ্রান্তি ও কুফরীমূলক আকীদার কিতাব কিতাবুস সুন্নাহ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সেরূপ ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদার ক্ষেত্রে তাদেরই রেফারেন্স গ্রন্থ হলো উসমান ইবনে সাইদ আদ দারামীর দুটি কিতাব। ১. কিতাবআন-নকজু আলা বিশর আল-মারিসি ২. আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া। উক্ত কিতাব দুটিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিপরীত এবং কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক আকীদা রয়েছে। যেগুলো সরাসরি কুফরী এবং শিরকী আকীদা হিসেবেই উলামায়ে কেরাম চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে বন্ধুবর মাওলানা মুফতী ইজহারুল ইসলাম আল কাওসারীর একটি গবেষণা পাঠকদের সহজার্থে সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রকাশ করা হলো।

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী (মৃত ২৮০ হি.)

শুরুতেই একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী এবং সুনানে দারিমীর লেখক একই ব্যক্তি নন। সুনানে দারিমীর লেখকের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান। তিনি ২৫৫ হি. মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী মৃত্যুবরণ করেন ২৮০ হি.।

তাঁর জীবনী গ্রন্থসমূহে তাঁর রচিত দুটি আকীদার কিতাবের নাম পাওয়া যায়। ১. আর রদ্দু আলাল-জাহমিয়া। ২. আর-রদ্দু আলা বিশর আল-মারিসি। সালাফীরা উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীকে তাদের প্রথম শ্রেণীর আকীদার ইমাম মনে করে এবং তাঁর এই কিতাব দুটিকে তাদের আকীদার কিতাবসমূহের মৌলিক কিতাব হিসেবে গণ্য করে। আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া কিতাবটি শায়খ বদর আল-বদর ১৯৮৫ সালে আদ-দারুস সালাফিয়্যা থেকে তাহকীকসহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে শায়খ যুহাইর আশ-শাবিশ আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে এটি প্রকাশ করেন। সৌদি আরবের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির ছাত্র মাহমুদ মুহাম্মাদ আবু রহীম ১৯৮৩ সালে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর আকীদা বিশ্লেষণ করে একটি উচ্চতর গবেষণাপত্র লেখেন। এই থিসিসের ওপর তিনি উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের নাম হলো, আল-ইমাম উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী ও দিফাউহু আন আকীদাতিস সালাফ, অর্থাৎ ইমাম উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী ও সলফে-সালেহীনের আকীদা সংরক্ষণে তাঁর পদক্ষেপ। বর্তমান সালাফীদের কাছে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর এই দুটি কিতাব এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে এর ওপর সৌদি শায়খরা নিয়মিত দরস দিয়েছেন। সালাফী শায়খ ড. আব্দুল্লাহ গুনাইমান ২০১০ সালে এই কিতাবের ওপর দরস দিয়েছেন। [ইউটিউবের এই লিংকে তাঁর দরস রয়েছে।

https://www.youtube.com/watch?v=tfBzsP KLXGQ]

সালাফীদের আরেক শায়খ ফয়সাল বিন কাযযার আল-জাসিম ২০০৬ সালে আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া কিতাবের ওপর দরস প্রদান করেছেন। [এই লিংকে তাঁর অডিও দরস পাওয়া যাবে। https://archive.org/details/jasim-jahmiah-darimi]

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর দ্বিতীয় আর-রদ্দু আলাল মারিসিও সালাফীদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের মৌলিক আকীদার কিতাবের অন্যতম কিতাব। ড. আলী সামী আন-নাশশার এটি তাহকীক করে প্রকাশ করেন। সালাফীরা শুধু তাঁর তাহকীকের ওপরই সন্তুষ্টি হয়নি। পরবর্তীতে আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া এর প্রধান শায়খ হামেদ ফকী এই কিতাবটি তাহকীক করে প্রকাশ করেন। সালাফীদের কাছে কিতাবটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে পূর্বোক্ত দুজনের তাহকীকে তারা সীমাবদ্ধ থাকেনি, পরবর্তীতে মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি থেকে ড. রশীদ বিন হাসান আল-মায়ী এটি তাহকীক করে মুমতাজ নাম্বার পেয়ে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর এই কিতাবে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সালাফী শায়খ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি। মোটকথা, উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর এই কিতাব দুটি সালাফী আকীদার মৌলিক কিতাব এবং এগুলো তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিতাব দুটির গুরুত্ব সম্পর্কে সালাফী আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো,

সালাফী শায়খদের নিকট দারিমীর কিতাবের গুরুত্ব :

সালাফী শায়খ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি বলেন :

يعتبر هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة من أهم الكتب المصنفة فى العقيدة على مذهب أهل السنة و الجماعة

অর্থ : উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর আর-রদ্দু আলাল মারিসি (৩ খণ্ডবিশিষ্ট) কিতাবটি আহলুস সুন্নাহ

ওয়াল জামাতের আকীদার ওপর লেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। [নকজু উসমান ইবনে সাইদ আলা বিশ আল-মারিসি, আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহির ভূমিকা।]

এখানে আহলুস সুন্নাহ দ্বারা তথাকথিত সালাফী আকীদা উদ্দেশ্য। বর্তমানের সালাফী আকীদা মূলত কাররামিয়াদের আকীদা নতুন নামে, নতুন মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহর দিকে সম্পৃক্ত করলেও আহলুস সুন্নাহর সাথে তাদের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

তিনি পরবর্তীতে উসমান ইবনে সাইদের কিতাব দুটি সম্পর্কে বলেন :

وقد أثنى العلماء على هذين الكتابين ونقلوا عنهما و إستشهدوا بما فيهما ، كما قال العلامة إبن القيم الجوزية رحمه الله تعالى

كتابا الدارمى :النقض على بشر المريسى والرد على الجهمية من أجل الكتب المصنفة فى السنة وأنفعها وينبغى لكل طالب سنة ,مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعين والأئمة أن يقرأ كتابيه .وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصى بهما أشد الوصية ، ويعظمها جدا ، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس فى غيرهما

و كان شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله ينقل من هذا الكتاب الصفحات فى مؤلفاته و ردوده كما فى كتابه الذى لا درء تعارض العقل و :نظير له فى بابه النقل و كما نقل عنه العلامة إبن القيم إجتماع الجيوش الإسلامية :فى كتابه على غزو المعطلة و الجهمية و كما نقل غيرهما من أهل العلم

অর্থ : আলেমগণ এই দুই কিতাবের ব্যাপারে খুবই প্রশংসা করেছেন। এখান থেকে তাঁরা উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এই কিতাবের আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন–আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন,

"উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর কিতাব, আন-নকজু আলা বিশর আল-মারিসি ও আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া, আকীদা বিষয় লিখিত শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে উপকারী কিতাবের অন্যতম। সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও ইমামদের আকীদা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী প্রত্যেক ছাত্রের কিতাব দুটি অধ্যায়ন করা উচিত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) কিতাব দুটি পড়ার ব্যাপারে যারপরনাই গুরুত্বের সঙ্গে ওসিয়ত করতেন। তিনি কিতাব দুটিকে খুবই সমাদর করতেন। কিতাবগুলোতে আল্লাহর একত্বতা, নাম ও গুণাবলি বিভিন্ন বর্ণনা ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। এ ধরনের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা অন্য কিতাবে পাওয়া যায় না।" [ইজতেমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া, পৃ. ৯০]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই কিতাব দুটি থেকে তাঁর রচনা ও জবাবমূলক বইগুলোতে ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন– তাঁর অনন্য কিতাব দরউ তায়ারুজিল আকলী ওয়ান নকলী-তে তিনি এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একইভাবে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর ইজতেমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া কিতাবে দারিমীর এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়া অন্য আলেমরাও এ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। [নকজু উসমান ইবনে সাইদ আলা বিশ আল-মারিসি, আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহির ভূমিকা]

সালাফী শায়ক ড. রশীদ বিন হাসান এই কিতাবের ছয়টি ইলমী গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন এবং সর্বশেষ তিনি লিখেছেন, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এই কিতাবের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন এই কিতাবের ইলমী মর্যাদার জন্য সেটিই যথেষ্ট। এরপর তিনি ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখেছেন, ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর দরউ তায়ারুজিল আকলী ওয়ান নকলি কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৯-৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ৬৬-৭৩ পর্যন্ত দারিমীর এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একইভাবে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর ইজতেমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া কিতাবে ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় এই কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারী আলেমগণ তথা ওয়াহাবীরাও এই কিতাব থেকে দলিল প্রদান করেছেন। যেমন–আদ-দুরারুস সানিয়্যা ফিল আজইবাতুন নজদিয়া কিতাবের তৃতীয় খণ্ডে ১০৯-১১১ পৃষ্ঠায় এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। [নকজু উসমান ইবনে সাইদ আলা বিশ আল-মারিসি, পৃ. ৯৯, তাহকীক, ড. রশীদ বিন হাসান আল-মায়ী]

একইভাবে সালাফী শায়খ হামিদ আল-ফকী ও শায়খ বদর আল-বদর এই কিতাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শায়খ ফয়সাল বিন কাজজার আল-জাসিম আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া সম্পর্কে বলেছেন :

وهذا الكتاب من الكتب الأصلية كما يقال أو من الكتب التى هى المرجع فى بيان معتقد أئمة السنة من الصحابة رضى الله عنهم و التابعين و أتباعهم وهو كتاب نفيس

"দারিমীর এই কিতাবটি আকীদার কিতাবসমূহের মাঝে মৌলিক কিতাব। অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামগণ তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের আকীদা বর্ণনায় এটিই মৌলিক উৎস। কিতাবটি খুবই মূল্যবান।

[https://archive.org/details/jasim-jahmiah-darimi]

সৌদি সরকারি মুফতী বোর্ড তথা আল-লাজনাতুত দাইমা লিল-বুহুসি ওয়াল ইফতার পক্ষ থেকে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর এই

কিতাবগুলোকে সীমাহীন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এই কিতাব সম্পর্কে বলেছেন :

فهذه الكتب هى الدواء الشافى والنور الهادى فى ظلم الجهل والشرك لما تشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ورد عثمان بن سعيد الدارمى على الجهمية ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة بن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الدعاة إلى الحق من أهل السنة والجماعة.

অর্থ : "অজ্ঞতা ও শিরকের অন্ধকারে এই কিতাবগুলো আরোগ্যদানকারী ওষুধের ন্যায় এবং হেদায়েত দানকারী আলোর ন্যায়। এই কিতাবগুলোতে কোরআনের আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন–ইবনে খোজাইমা (রহ.)-এর কিতাবুত তাউহীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কিতাবুস সুন্নাহ, উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া। একইভাবে ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীসহ হক্বের দিকে আহ্বানকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমদের কিতাবসমূহ।" [ফাতাওয়া আল-লাজনাতুত দাইমা, খ. ৭, পৃ. ৩৫৬। ফতোয়া নং ৪০৮৩]

এই ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেছেন আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন কুউদ। তাঁদের কাছে উল্লিখিত কিতাবগুলো এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে এগুলোকে শিরকের অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলো দানকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা তাঁদের এই দাবির বাস্তবতা বিশ্লেষণ করব ইনশাআল্লাহ।

মোট কথা, উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর এই কিতাব দুটি সালাফীদের মৌলিক আকীদার কিতাব এবং এগুলো তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকীদার কিতাব হওয়ায় এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে বর্তমানের সালাফীরা হলো কাররামিয়াদের উত্তরসূরি । এই কিতাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদাবিরোধী যেসব আকীদা রয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

দারিমীর কিতাবে শরীয়তবিরোধী আকীদাসমূহ :

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর কিতাব দুটিতে প্রচুর পরিমাণ জাল ও যঈফ বর্ণনা রয়েছে। কিছু কিছু বর্ণনাতে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলো কুফরী, শিরকী আকীদা বহণ করে, যা সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তা'আলার জন্য হরকত বা নড়াচড়া সাব্যস্ত করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা ও সৃষ্টির মাঝে দূরত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তা'আলার জন্য হদ বা সীমা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৫. যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সীমা সাব্যস্ত করেনি, তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে।

৬. সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলাকে বহন করে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাহমুল।

৭. আল্লাহ তা'আলার জন্য স্পর্শ সাব্যস্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্পর্শ করেন। তাঁর মতে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)- কে নিজ হাতের স্পর্শ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। [রদ্দুদ দারিমী আল বিশর আল-মারিসি, পৃ. ২৬, ২৯]

৮. দূরত্বের বিবেচনায় আল্লাহ তা'আলা ওপরের দিকে রয়েছেন। এমনকি পাহাড়ের ওপরের অংশ নিচের অংশ থেকে আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী।

৯. আরশকে অনাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে। [রদ্দুদ দারিমী আল বিশর আল-মারিসি, পৃ. ১২২]

১০. তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাছির ওপরও বসতে পারেন, তাহলে তিনি আরশের ওপর কেন বসতে পারবেন না?

১১. তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর বসেন এবং আরশ থেকে তিনি চার আঙুল বড়। [রদ্দুদ দারিমী আল বিশর আল-মারিসি, পৃ. ১১২]

১২. আল্লাহ তা'আলা কখনো আরশের ওপর বসেন, কখনো কুরসীর ওপর বসেন। [রদ্দুদ দারিমী আল বিশর আল-মারিসি, পৃ. ৭২]

১৩. তিনি আল্লাহর কথা বলার জন্য জিহ্বা সাব্যস্ত করেছেন। [রদ্দুদ দারিমী আল বিশর আল-মারিসি, পৃ. ৭৪]

১৪. তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা চলাফেরা করেন, যখন ইচ্ছা দাঁড়ান, যখন ইচ্ছা বসেন। [রদ্দুদ দারিমী আল বিশর আল-মারিসি, পৃ. ২০, তাহকীক হামেদ আল-ফকী]

আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থান সাব্যস্তকরণ :

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী বলেছেন :

كيف يهتدى بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده

অর্থ: বিশর কিভাবে তাওহীদের হেদায়েত পাবে, সে তো তার প্রভুর স্থান সম্পর্কে জানে না। [নকজু উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী, খ. ১, পৃ. ১৪২]

আল্লাহ তা'আলার সীমা :

উসমান ইবনে সাইদ একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, বাবুল হদ্দি ওয়াল আরশি, অর্থাৎ আল্লাহর সীমা ও আরশের পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদে তিনি আল্লাহর সমাপ্তি ও সীমা সাব্যস্ত করেছেন এবং যারা আল্লাহর সীমা

إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلق، ولم يحمله العرش عظما ولا قوة، ولا حملة العرش حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه، ولكنهم حملوه بقدرته، وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار فى عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته، ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السموات ولا الأرض ولا من فيهن، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات والأرض

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সব কিছু থেকে মহিমান্বিত এবং তিনি সব সৃষ্টি থেকে বড়। আরশ আল্লাহ তা'আলাকে নিজের ক্ষমতা বা বড়ত্বের দ্বারা বহন করেনি। আরশ বহনকারী ফেরেশতারা নিজেদের ক্ষমতা ও একক শক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বহন করেনি। বরং তারা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় তাকে বহন করেছে। আমাদের কাছে বর্ণনা রয়েছে, যখন তারা আরশ বহন করে এবং আরশের ওপর মহান আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন, তারা এটা বহন করতে দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা স্থির হয়ে পড়ে এবং হাঁটু গেড়ে বসে যায়। এরপর তাদেরকে বারবার লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তারা আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলাকে বহন করে। যদি আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা না থাকত, তাহলে আরশ, আরশ বহনকারী ফেরেশতা এমনকি আসমান-জমিনের কেউ আল্লাহ তা'আলাকে বহন করতে পারত না। যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন, একটা মশার ওপর বসতে পারেন, আল্লাহ পাকের কুদরতে মশা আল্লাহ তা'আলাকে বহন করবে, তাহলে আরশ কেন আল্লাহ তা'আলাকে বহন করতে পারবে না, সাব্যস্ত করে না, তাদেরকে কাফের বলেছেন। উসমান ইবনে সাইদ লিখেছেন :

وادعى المعارض ايضا أنه ليس لله حد ولاغاية و نهاية

অর্থ : প্রতিপক্ষ দাবি করেছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো সীমা, পরিসীমা ও সমাপ্তি নেই। [রদ্দুদ দারিমী আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ. ২৩]

এরপর তিনি লিখেছেন :

قال أبو سعيد :والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره .و لا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه .ولكن نؤمن بالحد .ونكل علم ذلك إلى الله .والمكانة أيضا حد ، وهو على عرشه فوق سمواته .فهذان حدان اثنتان

"আল্লাহ তা'আলার সীমা রয়েছে। তিনি ছাড়া এই সীমা সম্পর্কে কেউ জানে না। কারও জন্য নিজের অন্তরে আল্লাহর সীমার সমাপ্তি কল্পনা করা জায়েয নয়। বরং আমরা আল্লাহর সীমার ওপর ঈমান আনব এবং এর জ্ঞান আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করব। আল্লাহর স্থানও একটি সীমা। তিনি আসমানের ওপরে তাঁর আরশের ওপরে রয়েছেন। এই হলো আল্লাহ তা'আলার দুটি সীমা।" [রদ্দুদ দারিমী আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ. ২৩]

তিনি আরো লিখেছেন :

وقد اتفقت كلمة من المسلمين والكافرين أن الله فى السماء وحدوه بذلك

অর্থ : মুসলমান ও কাফের সবাই একমত যে আল্লাহ তা'আলা আসমানে রয়েছেন এবং তারা এভাবেই আল্লাহ তা'আলার সীমা সাব্যস্ত করেছে। [রদ্দুদ দারিমী আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ. ২৫]

যারা আল্লাহ তা'আলার সীমা সাব্যস্ত করে না তাদেরকে তিনি কাফের বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

هذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله

অর্থ : এগুলো হলো আল্লাহর সীমার দলিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সীমা সাব্যস্ত করে না সে আল্লাহর অবতীর্ণ কোরআনের ব্যাপারে কুফরী করে এবং আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে। [রদ্দুদ দারিমী আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ. ২৪]

আল্লাহ তা'আলা দাঁড়ান ও বসেন :

لأن الحى القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا يشاء ؛ ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا يشاء لأن أمارة ما بين الحى والميت التحرك . كل حى متحرك لا محالة .وكل ميت غير متحرك لا محالة .

অর্থ : চিরঞ্জীব ও চির শক্তিধর আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। যখন ইচ্ছা তিনি চলাচল করেন। যখন ইচ্ছা অবতরণ করেন, যখন ইচ্ছা ওপরে ওঠেন। যখন ইচ্ছা ধারণ করেন, যখন ইচ্ছা বিস্তৃত করেন। যখন ইচ্ছা তিনি দাঁড়ান, যখন ইচ্ছা বসেন।

একজন বুদ্ধিমান লোক এ ধরনের কুফরী কথাকে আল্লাহ তা'আলার দিকে কিভাবে সম্পৃক্ত করে? কারও যদি সামান্যতম তাওহীদের জ্ঞান থাকে, তবে সে এ ধরনের কুফরী কথা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো, আল্লাহর ইচ্ছার দিকে সম্পৃক্ত করে এগুলো সাব্যস্ত করেছে। তাহলে হিন্দুদের অপরাধ কী? তারা বলবে, ভগবান যখন ইচ্ছা গাভির রূপ নিতে পারেন, মানুষের রূপ নিতে পারেন, গাছের রূপ নিতে পারেন। খ্রিস্টানদেরই বা অপরাধ কী? তারাও বলবে, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা ঈসা (আ.)-এর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, তিনি লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাছির ওপরও বসতে পারেন।

যেটা আসমান ও জমিন থেকে বড়।[রদ্দুদ দারিমী আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ. ৮৫। তাহকীক, হামেদ আল-ফকী]

একজন মুসলমান কিভাবে এ ধরনের কুফরী কথা লিখতে পারে? কট্টর কাররামিয়া ছাড়া এ ধরনের নিকৃষ্ট কথা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করার ধৃষ্টতা অন্য কেউ দেখাবে কি না সন্দেহ। মুজাসসিমা ও মুশাববিহা আকীদা এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে ঢুকে গেছে যে আল্লাহ তা'আলার দিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কথা সম্পৃক্ত করতেও সামান্য দ্বিধা করে না। আমাদের আশ্চর্যের সীমা থাকে না, যখন দেখি, এ ধরনের কুফরী আকীদা থেকে ইবনে তাইমিয়া দলিল প্রদান করে এবং এগুলো তার কিতাবে উল্লেখ করে। কারও উদ্ধৃতি উল্লেখ করার দুটি উদ্দেশ্য থাকে। ১. তার কথা সমর্থন করা। ২. তার কথা খণ্ডনের জন্য সেগুলো উল্লেখ করা। ইবনে তাইমিয়া মূলত উসমান ইবেন সাইদ আদ-দারিমীর এই ভ্রান্ত আকীদা সমর্থন করে এগুলো তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া কিতাবে তিনি দুবার এই বক্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া, খ. ১, পৃ. ৫৬৮। খ. ২, পৃ. ১৬০]

অমুসলিমরা ইবনে তাইমিয়া ও উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর আকীদা থেকে নিজেদের কুফরী আকীদাগুলো প্রমাণ করতে পারবে খুব সহজেই। আল্লাহ তা'আলা যদি মাছির পিঠে বসতে পারেন, তাহলে তিনি ঈসা (আ.)-এর আকৃতি ধরে কেন আসতে পারবেন না? এটা সম্ভব হলে ওটা অসম্ভব হবে কেন? এ জন্য খ্রিস্টান লেখক ক্রিস্টোফার হাউস দি টেলিগ্রাফের ব্লগে ৪ এপ্রিল, ২০০৯ সালে একটি নিবন্ধ লিখেছে। সে এর নাম দিয়েছে, Ibn TaymiyyaOs mosquito and the Gospel of St John অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়ার মাছি ও গোস্পেল অব জন। ক্রিস্টোফার হাউস তার প্রবন্ধের শেষে লিখেছে :

IOm not sure where mosquitos come in. But if God could settle on a mosquitoOs back, why could he not take flesh and dwell amongst us?

অর্থ : "আমি জানি না, মাছির ধারণা কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যদি মাছির পিঠে বসতে পারেন, তাহলে তিনি কেন রক্ত-মাংস গ্রহণ করে আমাদের মাঝে বসবাস করতে পারবেন না?

[http://blogs.telegraph.co.uk/culture/christopherhowse/9382627/ibn_taymiyyas_mosquito_and_the_gospel_of_st_john/]

পৃথিবীর এমন কোনো নিকৃষ্ট আকীদা নেই, যা এই মাছির ধারণা থেকে প্রমাণ করা যাবে না। বহু ঈশ্বরের ধারণা, সর্বেশ্বরবাদ, অবতার, ত্রিত্ববাদসহ পৃথিবীর যত নিকৃষ্ট আকীদা আছে সব কিছু উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী ও ইবনে তাইমিয়ার এই ধারণা থেকে প্রমাণ করা সম্ভব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এ ধরনের স্পষ্ট ভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন।

ইমাম ইবনে জাহবাল কিলাবীর লেখা আর-রদ্দু আলা মান কালা বিল জিহা এর ইংরেজি অনুবাদ করেছে, ড. জিবরীল ফুয়াদ হাদ্দাদ। তিনি এর ইংরেজি নাম দিয়েছেন, The Refutation of him [Ibn Taymiyya] who attributes direction to Allah [Al Raddu ala Man Qala bil Jiha]

এই কিতাবের ভূমিকা লেখে দিয়েছেন শায়খ ওহবী সুলাইমান গাওজী (রহ)। ড. জিবরীল ফুয়াদ এই বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় ইবনে তাইমিয়া ও উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর মাছির ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। [Dr. G. F. Haddad, The Refutation of Him Who Attributes Direction to Allah, Aqsa Publications, Birmingham, UK, 2008, p. 83.]

পাহাড়ের ওপরের অংশ নিচের অংশ থেকে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী :

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী তাঁর কিতাবে লিখেছেন,

فيقال لهذا المعارض المدعى ما لا علم له من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله

অর্থ : "এই অজ্ঞ অভিযোগকারীকে বলা হবে, তোমাকে কে বলেছে, পাহাড়ের ওপরের অংশ পাহাড়ের নিচের অংশ থেকে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী নয়? কেননা যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে যে আল্লাহ আসমানসমূহের ওপরে আরশের ওপরে রয়েছেন সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে পাহাড়ের ওপরের অংশ নিচের অংশ থেকে অধিক নিকটবর্তী।" [রদ্দুদ দারিমী আল বিশর আল-মারিসি, পৃ. ১০০]

ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী (রহ.) এই বক্তব্যের ওপর মন্তব্য লিখেছেন :

فعند إمام المجسمة هذا ، من علا فى الجو بالطائرة يكون أقرب إلى معبوده من هذا وذاك ويدل كلامه هذا على أنه كان يتطلع إلى معبوده من رؤوس الجبال و المآذن و المراصد كما هو صنيع الصائبة الحرانية عبيدة الأجرام العلوية وأما المسلمون فهم يعتقدون أن الله منزه عن المكان وأن نسبته إلى الأمكنة سواء فليس القرب منه بالمسافة وليس البعدعنه بالمسافة قال الله تعالى واسجد و اقترب وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائى وغيره أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن الذى يجهل أن سمت رأس هذا الواقف على هذا الجبل فى هذا القطر

يعاكس كل المعاكسة إتجاه رأس ذلك الواقف على رأس ذلك الجبل فى أمريكا مثلا

অর্থ : ভ্রান্ত মুজাসসিমা ফেরকার ইমামমের নিকট যে বিমান বা হেলিকপ্টারে ওপরের দিকে উঠবে সে অন্যদের চেয়ে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হবে। তার এ কথা থেকে বোঝা যায় সে পাহাড়, মিনার ও বড় বড় অট্টালিকার ওপর উঠে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করত। যেমন–হাররানী সায়েবারা আজরামে আলিয়া বা মহাজগতিক কিছু বস্তুর পূজা করত। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা স্থান থেকে পবিত্র। আল্লাহ তা'আলার জন্য সমস্ত মাখলুক বা স্থান সমান। আল্লাহর নৈকট্য দ্বারা পরিমাপ বা স্থানগত নৈকট্য বোঝায় না এবং আল্লাহর দূরত্ব দ্বারা পরিমাপ বা স্থানগত দূরত্ব উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন [অনুবাদ], সিজদা দাও এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হও। [সূরা আলাক, আয়াত নং ১৯]

ইমাম নাসায়ীসহ অন্য ইমামগণ রাসূল (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন [অনুবাদ] : সিজদারত অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। এ কথা কে না জানে যে, কোনো এক মেরুর কোনো পাহাড়ের ওপরে কেউ থাকলে ঠিক তার বিপরীত মেরু অনুযায়ী সে নিচে রয়েছে। যেমন–আমেরিকার কোনো পাহাড়ে কেউ থাকলে সে আমাদের ঠিক নিচে রয়েছে। [মাকালাতুল কাউসারী, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী (রহ.)-এর প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ২৬৪-২৬৫]

ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী (রহ.) আরো লিখেছেন :

فتبا لهذا العقل الوثنى لهذا الهرم وتبا ثم تبا لعقول الذين يتابعونه فى ذلك أو يثنون عليه

অর্থ: "এই হিন্দুয়ানি চিন্তা এবং পিরামিডীয় ধারণা ধ্বংস হোক। ধ্বংস তাদের জন্য, যারা এই চেতনা অনুসরণ করে অথবা এগুলোর প্রশংসা করে। [মাকালাতুল কাউসারী, পৃ. ২৬৫]

দারিমীর কিতাবে যেসব আকীদা লেখা আছে সেগুলো মুসলমানদের আকীদা নয়। এগুলো সব কাররামিয়া ও মুজাসসিমাদের আকীদা। বর্তমান সালাফীরা এসব ভ্রান্ত কুফরী, শিরকী আকীদাকে নতুন নাম দিয়ে নতুন মোড়কে উপস্থাপন করছে। বর্তমানের সালাফীরা মূলত কাররামিয়াদের আক্বীদাগুলো মানুষের সামনে প্রচার করছে। তাদের সাথে কাররামিয়াদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ পাক পুরো মুসলিম উম্মাহকে এসব হিন্দুয়ানি আকীদা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

উসমান ইবনে সাইদ সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত :

ঐতিহাসিক ও রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীর (মৃত ২৮০ হি.) জীবনী লিখেছেন। তার মধ্যে ইমাম যাহাবী (রহ.) আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করেছেন। [আল-উলু, খ. ১, পৃ. ১৯৫] সালাফী শায়খ আলবানীও দারিমীর এই বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করেছেন। [মউসুআতুল আল্লামা আলবানী, খ. ১, পৃ. ১৩৮]

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকী (রহ.) লিখেছেন, তিনি কাররামিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন এবং তাদের বিরোধিতা করেছেন। ইমাম সুবকির বক্তব্য থেকে একটা বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী মূলত কাররামিয়াদের বিরুদ্ধে লিখেছেন, এ জন্য কাররামিয়ারা তাঁর নামে দুর্নাম করার জন্য এই বিষয়গুলো তার কিতাবে ঢুকিয়েছে। বিষয়টি যদি এমন হয় যে, কাররামিয়ারা তার কিতাবে এসব কুফরী আকীদা ঢুকিয়েছে, তাহলে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী এসব ভ্রান্ত আকীদা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে আমরা মেনে নেব। কিন্তু তিনি যদি এগুলো লিখে থাকেন, তাহলে তিনিই অবশ্যই ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী মুজাসসিমা ছিলেন।

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী এগুলো লিখেছেন কি না, সেটা বড় বিষয় নয়। বরং যারা কুফরী, শিরকে ভরা এসব কিতাবের প্রশংসা করছেন, এগুলো প্রকাশ করছেন এবং এগুলোর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের সম্পর্কে আমাদের কী ধারণা রাখা উচিত?

প্রথমত, স্পষ্ট কুফরী, শিরকে ভরা এসব কিতাব পড়ার প্রতি উৎসাহিত করে, এগুলোর প্রশংসা করে এবং এগুলোর প্রকাশ, তাহকীক এবং প্রচারের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, তারা মূলত এগুলো প্রকাশ ও প্রচারের দ্বারা মানুষকে ভ্রান্ত আকীদার দিকে দাওয়াত দেয়। সাধারণ মানুষের মাঝে এগুলো প্রচার ও এগুলোর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। যারা এগুলো করছে তারা সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা এসব কিতাব প্রচার করে সাধারণ মানুষকে স্পষ্ট কুফরীর দাওয়াত দিচ্ছে। এসব কিতাব যেহেতু সালাফী আকীদার মৌলিক কিতাব, সুতরাং বর্তমানের তথাকথিত সালাফী আকীদা মূলত পথভ্রষ্ট কাররামিয়া ফেরকারই নতুন রূপ। কাররামিয়া ফেরকা যেমন পথভ্রষ্ট, বর্তমানের সালাফী আকীদাও বাতিল ও পথভ্রষ্ট। যারা সালাফী আকীদার নামে এগুলো প্রচার করেছে বা করছে, তাদের জন্য তাওবা করে সহীহ আকীদা গ্রহণ করা জরুরি।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)